ক্রুসেড-২৯
রিচার্ডের নৌবহর
আসাদ বিন হাফিজ

ক্রুসেড - ২৯

রিচার্ডের নৌবহর

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন

৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

ক্রুসেড - ২৯

রিচার্ডের নৌবহর

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর 'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৬

প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার

মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ ৫০.০০

CRUSADE-29

Richarder Nowbahar

[A heroic Adventure of the great Salahuddin]

by : Asad bin Hafiz

Published by : Pritee Prokashon

435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217

Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758

Published on: May 2006

PRICE : Tk. ৫০.০০

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র। একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

▼ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▼ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ▼ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ▼ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▼ ভয়াল রজনী ▼ আবারো সংঘাত ▼ দুর্গ পতন ▼ ফেরাউনের গুপ্তধন ▼ উপকূলে সংঘর্ষ ▼ সর্প কেল্লার খুনী ▼ চারদিকে চক্রান্ত▼ গোপন বিদ্রোহী ▼ পাপের ফল ▼ তুমুল লড়াই ▼ উমরু দরবেশ ▼ টার্গেট ফিলিস্তিন ▼ গাদ্দার ▼ বিষাক্ত ছোবল ▼ খুনী চক্রের আস্তানায় ▼ পাল্টা ধাওয়া ▼ ধাপ্পাবাজ ▼ হেমসের যোদ্ধা ▼ ইহুদী কন্যা ▼ সামনে বৈরুত ▼দুর্গম পাহাড় ▼ ভণ্ডপীর ▼ ছোট বেগম ▼ রক্তস্রোত ▼ রিচার্ডের নৌবহর ▼ **মহাসমর**

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পুনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?

চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ– 'অপারেশন'।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের বই

আতংকিত নানকিং ▼ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত ▼ ব্ল্যাক আর্মির কবলে ▼ হাইনান দ্বীপে অভিযান ▼ অশান্ত চীন সাগর ▼ বিধ্বস্ত শহর ▼ ড্রাগনহিলের বিভীষিকা ▼ মৃত্যু দ্বীপ ▼ রক্তাক্ত প্রাচীর

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী শৈশব কালে তার পিতা নাজমুদ্দিন আইয়ুবীর কাছ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসের অবমাননা ও সেখানকার মুসলমানদের ওপর জঘন্য বর্বরতার কাহিনী শুনেছিলেন। তার পিতা এ কাহিনী শুনেছিলেন তাঁর দাদা শাদী আইয়ুবীর কাছ থেকে।

শৈশবের শোনা সেই নির্মমতার কাহিনী তার ছোট্ট হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বয়স বাড়লেও সেই কাহিনীর কথা তিনি কোন দিন ভুলতে পারেননি। বরং সুলতান আইয়ুবী অনুভব করছিলেন, যতই তার বয়স বাড়ছে ততোই তার রক্তে, তার শিরায় শিরায় সেই বর্বরতার তিক্ত স্মৃতি প্রচন্ড আলোড়ন ও ঝড় তুলছে।

শৈশবে যখন তিনি এ কাহিনী শুনেছিলেন তখনই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বায়তুল মোকাদ্দাস তিনি একদিন মুক্ত করবেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই শপথ তার দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে।

আজ বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত করতে এসে তাঁর মনে পড়ে গেল, তিনিও তাঁর দুই সন্তানকে শৈশবেই এ কাহিনী শুনিয়েছেন। তাদের একজন এখনো কিশোর থাকলেও অন্যজন এরই মধ্যে যৌবনের সিংহদরোজা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জেহাদের ময়দানে। কিশোর আল মালেক আল জাহেরের অন্তরেও নিশ্চয়ই এমনি প্রতিজ্ঞা দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছে। আর যুবক আল আফজাল তো এই স্বপ্ন

বাস্তবায়নের জন্যই যোগ দিয়েছে সেনাদলে।

তিনি ভাবছিলেন, আজ যদি আমি সফল হতে না পারি তবে কি এ স্বপ্ন মুছে যাবে? না, নিশ্চয়ই আল আফজাল ও মালেক আল জাহের এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আবারো কোন বাহিনী নিয়ে ছুটে আসবে জেরুজালেম। মসজিদুল আকসা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই জিহাদ চলবে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। মুক্তির ময়দান কখনো নিরব হবে না, হতে পারে না।

'উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।' আল আফজাল যখন সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছিল তখন তিনি তাকে বললেন, 'এ কথা তোমার দাদা মরহুমের। তিনি এ কথা আমাকে ঠিক সেই সময় বলেছিলেন, যখন আমি চাচা শেরকোহ-এর সঙ্গে ক্রুসেডের বিরুদ্ধে প্রথম জিহাদে যাত্রা করি।

তিনি আরও বলেছিলেন, আমার মনে হচ্ছে, তুমি কোনদিন এ দেশের আমীর হবে। এমনও হতে পারে তুমি সুলতান হয়ে যাবে। তবে যাই হও না কেন, একটা কথা মনে রাখবে, আজ থেকে তুমি কেবল আমার বেটা নও, তুমি এক মহান জাতির সন্তান। কোরআনে বলা হয়েছে, সন্তান মা বাবার খেদমত করবে। এখন তোমার মা ও বাবা হচ্ছে তোমার দেশ ও জাতি। সন্তানের উচিত নয় মা বাবাকে দুঃখ দেয়া। আল্লাহ কঠোর ভাষায় এ ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন।

তোমাকে আল্লাহ তার অনন্ত সৃষ্টিধারায় একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন। সময়ের সেই প্রয়োজনটি কি

তা তোমাকে বুঝতে হবে। তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে জাতির কোন খেদমতটি তুমি সবচে উত্তমভাবে সম্পাদন করতে পারবে। নিজের আরাম আয়েশ ও সুখ ভোগের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়নি। তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর অনন্ত সৃষ্টিরাজির মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য। সভ্যতার অগ্রগতি সাধনের জন্য। মানবতার কল্যাণের জন্য। আপন জাতির দুঃখ মোচনের জন্য।

প্রিয় বেটা আমার! আপন জাতিকে দুঃখ দিও না। তাকে নিরাশ ও হতাশ করো না। জাতির পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা সুষ্ঠুভাবে পালন করো।'

সুলতান আইয়ুবী তাঁর ছেলেকে বললেন, 'হে আমার নয়নের মনি! তোমার দাদা বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জিহাদ করতে গিয়ে শহীদ হয়ে যায় তারচে সৌভাগ্য আর কার! এমন শহীদদের কখনও ভুলে যাবে না।

যে জাতি তার শহীদ সন্তানদের ভুলে যায় আল্লাহ নিজেও সে জাতিকে ভুলে যান। আর যে জাতির উপর থেকে আল্লাহর দৃষ্টি উঠে যায়, সে জাতির জন্য দুনিয়াটা জাহান্নামে পরিণত হয়ে যায়।

তখন তাদের মসজিদ ও পবিত্র স্থানগুলো দুশমনের আস্তাবলে পরিণত হয়। তাদের কন্যাগুলো শত্রুদের বিলাসিতার সামগ্রী হয়ে যায়। দুনিয়ার কোথাও তারা একটু শান্তি ও স্বস্তির জায়গা খুঁজে পায় না।'

বাপ আমার! মনে রেখো, এমন জাতির কিসমত থেকে

সৌভাগ্য বের হয়ে যায়। তারা তখন পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যখন তোমাকে শাসন ক্ষমতায় বসানো হবে, তখন জাতিকে প্রজা ভাববে না।

মনে রেখো, মানুষের ওপর শাসন করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের। যদি জনগণকে শাসন করতে গিয়ে আল্লাহর ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নাও তার পরিণতি তোমার জন্য কখনো মঙ্গলময় হবে না। নিজেকে রাজাধিরাজ ভাবলে সেই পাপের শাস্তি পাবে মিশরের ফেরাউনদের মতো।

ভেবে দেখো, কত শতাব্দী পার হয়ে গেছে, আজো মানুষ তাদের কথা মনে পড়লে ধিক্কার দেয়। আল্লাহর এমন অভিশাপ ও লানত তাদের কপালে জুটেছে যে, আল্লাহ তাদের মমি বানিয়ে রেখেছেন, যাতে তাদের কথা মানুষ কোন দিন ভুলতে না পারে। যাতে যুগ যুগ ধরে তারা মানুষের অভিশাপ বয়ে বেড়ায়।

যদি কখনো ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাও, মনে করবে আল্লাহ তোমার কাঁধে কোন বিরাট বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া এই বোঝা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলা যেমন অন্যায়, এই দায়িত্বকে বোঝা না ভেবে একে নিজের দম্ভ প্রকাশের হাতিয়ার মনে করাও অপরাধ। মনে রেখো, ক্ষমতা দৃশ্যতঃ জাতির পক্ষ থেকে এলেও আসলে তা আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে।

সরকারের সম্পদকে কখনো নিজের সম্পদ ভেবো না। বরং এসবকে ভাববে জনগণের জন্য দেয়া আল্লাহর আমানত।

সরকারকে হতে হবে জাতির আশ্রয়স্থল। জাতিকে যদি অর্ধাহারে রাখতে হয় সরকারী লোকজনকে থাকতে হবে অনাহারে। তাহলেই জাতির ভালবাসায় সিক্ত হবে সরকার।

মসজিদের মিনারের মত সরকার প্রধানের মাথা থাকবে সবার উপরে। যেন তিনি দেখতে পান কেউ কোথাও বঞ্চিত হচ্ছে কিনা তার প্রাপ্য অধিকার থেকে।

হে আমার প্রিয় বেটা! তোমার দাদা আরও বলেছেন, 'সেই দিন তুমি মাথা উঁচু করে চলবে যেদিন তুমি মসজিদুল আকসা শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করতে পারবে। শান্তির ঘুম তুমি সেদিন ঘুমাবে, যেদিন তুমি মসজিদুল আকসায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে নফল নামাজ পড়তে পারবে।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) মেরাজে যাওয়ার আগে এই মসজিদুল আকসায় নফল নামাজ পড়েছিলেন। সে মসজিদের বারান্দায় যেদিন তুমি তোমার অশ্রু ঝরাতে পারবে সেদিন ভাববে, তুমি আল্লাহর রহমত পাওয়ার যোগ্য হয়েছো।'

বাপ আমার! জেরুজালেমের অলিতে গলিতে কত যে নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করেছিল, পবিত্র মসজিদের আঙ্গিনায় জাতির কত যে আদরের কন্যা সম্ভ্রব হারিয়েছিল, সে কথা স্মরণ হলে আজো আমার রাতে ঘুম হয় না।

যে মসজিদে আমার প্রিয় রাসুলের মুবারক পা পড়েছিল, যে মসজিদে আমার রাসুলের পেশানী মুবারক সিজদায় পড়েছিল, সে মসজিদের অপবিত্রতার কথা স্মরণ হলে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে।

মনে হয় আমি যেন নির্যাতীতের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। যেন মসজিদুল আকসার বারান্দায় মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে শিশু ও নারীরা। যেন কেউ কম্পিত কণ্ঠে সেখানে আযান দিচ্ছে। সেই আযানের মধ্য দিয়ে সে যেন আমাকেই ডাকছে।

তোমার দাদা বৃদ্ধ বয়সে কম্পিত হাতে আমার হাত আঁকড়ে ধরে বলেছিলেন, 'বেটা, আমার জীবন ও যৌবন শেষ হতে চললো। যে কাজ আমি সম্পন্ন করতে পারিনি সে কাজের ভার আমি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি বায়তুল মোকাদ্দাসকে শত্রু মুক্ত করো। এইটিই হোক তোমার জীবনের লক্ষ্য।

তুমি ক্ষমতায় গেলে শত্রুদের উপেক্ষা ও তুচ্ছ মনে করবে। তাতে তোমার সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি পাবে।

তুমি যদি আল্লাহর ওপর ভরসা করতে পারো তবে মনে রেখো, আল্লাহর চাইতে ক্ষমতাধর কেউ নেই দুনিয়ায়। তুমি আল্লাহর ওপর আস্থা রাখতে পারলে আল্লাহ তোমার নেগাহবান হয়ে যাবেন। তখন তুমি নিশ্চিন্তে জাতির উপর শান্তির শাসন চালাতে পারবে।

হয়তো তোমার শাসন ক্ষমতার বয়স দীর্ঘ হবে না। কুচক্রীদের চক্রান্তে উল্টে যাবে তোমার সুখের মসনদ। কিন্তু কুচক্রীদের সাথে মিলে গদী রক্ষা করতে যেয়ো না। জীবনে বেঁচে থাকার একটাই উদ্দেশ্য থাকবে, আর তা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জন। জীবনভর সেই পথে চলবে, যে পথ আল্লাহর প্রিয়, যে পথে চলার নির্দেশ দিয়েছে পবিত্র কোরআন।'

সুলতান আইয়ুবী তার সন্তানকে লক্ষ্য করে সেদিন বলেছিলেন,

'হে আমার প্রিয় সন্তান! আমি আমার পৈতৃক উত্তরাধিকার তোমার উপর ন্যস্ত করছি। আমি আমার পিতার মতোই বলছি, আজ থেকে তোমরা আমার নও, মুসলিম জাতি ও মিল্লাতের সন্তান।

আমি তোমাদের মাকেও বলে দিয়েছি, তুমি ভুলে যাও তোমার গর্ভে কোন সন্তান জন্ম নিয়েছিল। যদি ভুলতে না পারো তবে সন্তানকে আল্লাহর পথে দান করে দাও। কারণ আমি জাতির জন্য তোমার দুটি সন্তানকেই কোরবানী দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তোমাদের মাকে আমি আরো বলেছি, মনে করে দেখো, হযরত ইবরাহীম (আ.) সন্তানকে আল্লাহর পথে কোরবানী দিতে গিয়ে নিজ হাতে ছুরি চালিয়েছিলেন আপন সন্তানের গলায়।

যদি তুমি কোন দোয়া করতে চাও তবে আল্লাহর কাছে এই দোয়া করো, তুমি যে সন্তানদের বুকের দুধ পান করিয়েছো সে দুধ যেন রক্ত হয়ে মসজিদুল আকসার পবিত্র বারান্দা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। প্রতিজ্ঞা করো বেটা, আমি যদি বেঁচে না থাকি তবে বায়তুল মোকাদ্দাস তোমরা দুই ভাই মুক্ত করবে।'

সুলতান আইয়ুবীর মনে পড়ে গেল তিনি এবার বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধার অভিযান শুরু করার আগে তাঁর দুই সন্তানকেই কাছে ডেকেছিলেন। তিনি ১০৯৯ সালের যুদ্ধের সেই রক্তাপ্লুত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের বলেছিলেন, 'যাও বেটা। আল্লাহর সিপাই হও গিয়ে। আমি দোয়া করি, ব্যর্থতা যেনো কখনো তোমাদের স্পর্শ না করে। ভয়-ভীতি,

লোভ ও অজ্ঞতা থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবে।'

দুই ভাই রণাঙ্গনে যাওয়ার আগে সুলতান আইয়ুবীর সাথে দেখা করে তাকে সালাম করলো। তিনি তাদের সাথে মুসাফেহা ও কোলাকুলি করলেন। বললেন, 'হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে লড়াই করবে। আল্লাহ তোমাদের নেগাহবান হোন।'

তারা বাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো। বড় ছেলে আফজাল ঘোড়ায় উঠতে উঠতে বললো, 'মহান সুলতান! শুধু শহীদ হওয়াতে কোন কৃতিত্ব নেই। আমি শহীদ হওয়ার আগে বায়তুল মোকাদ্দাসের গলিতে শত্রুদের এত রক্ত প্রবাহিত করবো যে, আপনার ঘোড়ার পা যেন পিছলে যায়। আমরা দেখতে চাই, আপনি মসজিদুল আকসার ক্রুশ ও মুর্তি নিজ হাতে তুলে রাস্তায় খৃস্টানদের নাপাক রক্তের মাঝে ফেলে দিচ্ছেন।'

'কিন্তু সে রক্ত যেন নিরস্ত্র শহরবাসীর না হয় বেটা।' সুলতান আইয়ুবী বললেন।

'সে রক্ত ক্রুসেড বাহিনীর বর্ম পরা নাইটদের হবে।' আল আফজাল বললো, 'সে রক্ত সেই সব লৌহ পোষাকের ফাঁক গলে বের হবে, যে পোষাক পরে ক্রুসেড বাহিনী আজো গর্বের হাসি হাসে। আপনি দেখে নেবেন, ঈমানদারের অস্ত্র বেঈমান কাফেরদের লোহার পোষাক ছিন্নভিন্ন করার শক্তি রাখে।'

'আল্লাহ তোমাদের কথায় বরকত দান করুন।' সুলতান আইয়ুবী বললেন। সন্তানদ্বয় পিতাকে সামরিক কায়দায় স্যালুট দিয়ে ঘোড়া হাকিয়ে দিল। এক সময় সুলতান আইয়ুবীর দৃষ্টি

থেকে হারিয়ে গেল তার দুই সন্তান।

সুলতন আইয়ুবী বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে চল্লিশ মাইল দুরে ভুমধ্যসাগরের তীরে আসকালান শহরে সেই চিতা বাঘের মত বসে আছেন, যেন তিনি শিকার ধরার জন্য ওঁৎ পেতে আছেন। আবেগে তাঁর অবস্থা তখন টলোমলো। বিলম্ব না করে পারলে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস উড়ে যেতে চান। শিকারকে তাড়া করা বাঘের মতই জেরুজালেম ছুটে যেতে চাচ্ছিলেন তিনি। খৃস্টানদের সাথে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ছটফট করছিল তার মন। কিন্তু যুদ্ধের নিয়ম ও কৌশলের কথা চিন্তা করে তিনি তখনো আসকালানেই অবস্থান করছিলেন।

জেরুজালেম ওখান থেকে আর মাত্র চল্লিশ মাইল। কিন্তু এ দীর্ঘ চল্লিশ মাইল রাস্তা যেন খই ভাজা তপ্ত বালি ও পাথরে বোঝাই। এটা ছিল বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতিরক্ষার প্রকৃতি-প্রদত্ত সুবিধা।

তাছাড়া এ শহরটি শুধু শহরের প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল না। শহরের আশেপাশে দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছোট ছোট কেল্লা গড়ে তোলা হয়েছিল শহরটি রক্ষার জন্য। সেই কেল্লাগুলো খৃস্টানদের সুরক্ষিত সেনা ফাঁড়ি হিসাবে কাজ করছিল।

সুলতান জানেন, শহরের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত আছে খৃস্টানদের টহলদার বাহিনীও। এরা শহরের বাইরে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে পাহারা দেয় দূর দূরান্ত পর্যন্ত। এমন কড়া ও সতর্ক

নিরাপত্তা ব্যবস্থার বেড়াজাল ভেদ করে বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছা যে কারো জন্যই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সুলতান আইয়ুবীর আগমনের খবরে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও কঠিন করা হয়েছে। কিন্তু তাদের এমন সাহস ছিল না যে তারা অগ্রসর হয়ে সুলতান আইয়ুবীকে আসকালান শহরে বাঁধা দেয় অথবা আক্রমণ চালায়।

কারণ ক্রুসেড বাহিনী হাতিন রণাঙ্গন থেকে আসকালান পর্যন্ত সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর হাতে যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির শিকার হয়েছে এবং যে পরিমাণ রক্ত ও জান মালের ক্ষয় ক্ষতি কবুল করেছে তাতে তাদের এ রকম সাহস করার কোন সুযোগ ছিল না।

সুলতান আইয়ুবী বায়তুল মোকাদ্দাসের সব তৎপরতা ও খৃস্টান জেনারেলদের গতিবিধি প্রতি মুহূর্তে অবগত হচ্ছিলেন। তিনি জানেন, বায়তুল মোকাদ্দাসের তখনকার শাসক সম্রাট গে অব লুজিয়ান হাতিনের রণক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দী হয়ে এখন দামেশকের কারাগারে বন্দী। তারপরও খৃস্টান নাইট ও বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সেনাবাহিনী ও তার জেনারেলরা সহজে এ শহরটি সুলতানের হাতে তুলে দেবে না।

হাতিনের রণাঙ্গনে গে অব লুজিয়ান যে সব সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলেন তার কিছু মারা গিয়েছিল, কিছু যুদ্ধবন্দী হয়েছিল। কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পালাতে পেরেছিল, যাদের অধিকাংশই ফিরে গিয়েছিল জেরুজালেম।

পলাতকদের মধ্যে সৈন্যের চাইতে বেশী ছিল অফিসার এবং লৌহ পোষাকধারী নাইট। সুলতান জানেন, তারা অধিকাংশই আহত হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে আশ্রয় নিলেও নাইটদের মধ্যে যে নৈতিক মনোবল (Moral courage) থাকে তা তাদেরকে আবার লড়াইয়ের ময়দানে টেনে আনবে। কারণ পদমর্যাদার সম্মান বজায় রাখতে না পারলে খৃষ্ট সমাজে তাদের বেঁচে থাকা হবে অর্থহীন।

কিন্তু সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে এ নৈতিক মনোবল অবশিষ্ট ছিল না। তারা পালিয়ে জেরুজালেম পৌঁছেই সেখানে ব্যাপক আতংক ছড়িয়ে দিল। সেই আতংক দূর করার জন্য খৃস্টান জেনারেল ও নাইটরা অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সুলতানের গোয়েন্দা বাহিনী যে খবর দিল তাতে তিনি জানতে পারলেন, বায়তুল মোকাদ্দাস শহরের ভেতরে খৃস্টানদের সৈন্য সংখ্যা তখনো ষাট হাজার।

তিনি আরও জানতে পারলেন, সুলতান আইয়ুবী শহরের পর শহর জয় করে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এ খবর ছড়িয়ে পড়লে উৎসাহী খৃস্টানরা সুলতানকে বাঁধা দেয়ার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে হাজির হচ্ছে পবিত্র শহরে। এদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। তারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ক্রুশের জন্য জীবন দিতে চায়। ওরা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী না হলেও ওদের আবেগই একটা বিরাট অস্ত্র। কোন জনপদের জনগণ এভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তাদের পরাজিত করা খুব কঠিন। এদের কারণে

শহরের প্রতিরক্ষা শক্তি নিঃসন্দেহে আরও মজবুত হয়েছে।
জেরুজালেম শহরের প্রতিটি ফটকে তখন বিরাজ করছিল কড়া নিরাপত্তা প্রহরা। কিন্তু তারপরও দু'একটি ফটক খোলা রাখতে হচ্ছিল বিশেষ কারণে। কারণ যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা খৃস্টান সৈন্যরা তখনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বা একজন দু'জন করে ফিরে আসছিল জেরুজালেম। সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারা এসব খবরও সুলতানকে সরবরাহ করছিল।
সুলতান আইয়ুবী এ সব পলাতক সৈন্যদের সাথে মিশে আরো কিছু গোয়েন্দাকে শহরে ঢুকে পড়ার হুকুম দিলেন। কারণ তিনি আশংকা করলেন এমনও সময় আসতে পারে, যখন ভেতরের গোয়েন্দারা আর বেরোতে পারবে না। কিন্তু নির্যাতীত খৃস্টান সৈন্য হিসাবে এই নতুন গোয়েন্দারা কিছুটা সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে।
সুলতানের হুকুম পেয়ে আরো কিছু গোয়েন্দা ছদ্মবেশে শহরে প্রবেশ করলো। তারা শহরের প্রতিটি আনাচে কানাচে ঘুরে দেখলো শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধরন। শহরের প্রতিটি ফটক, প্রাচীরের অবস্থা, সৈন্যদের ব্যারাক সবকিছু তারা খুঁটিয়ে দেখলো এবং তার একটি ম্যাপ হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে বেরিয়ে এলো শহর থেকে।
সেখানকার মুসলমানদের অবস্থা তখন গৃহবন্দী পর্যায়ের। ঘর থেকে বেরোনোই তাদের জন্য বিপদজনক হয়ে উঠলো, শহর থেকে বেরোনোর তো কোন প্রশ্নই আসে না। ফলে সুলতানের আশংকা সত্যে পরিণত হলো, মুসলিম গোয়েন্দাদের একটা

অংশ আটকা পড়ে গেল ভেতরে।

সুলতান বুদ্ধি করে নতুন গোয়েন্দা না পাঠালে শহর থেকে তথ্য পাচার করা লোকের অভাব দেখা দিতে পারতো। কিন্তু সুলতানের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে একটি অবশ্যম্ভাবী সংকটের হাত থেকে বেঁচে গেল মুসলিম বাহিনী।

বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে দশ বারো মাইল দূরে আসকালানের পথে খৃস্টানদের এক ফাঁড়ি। এখানে একশোর মতো ক্রুসেড সৈন্য অবস্থান করছিল।

১১৮৭ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের এক রাত। খৃস্টান সৈন্যরা সবাই ক্যাম্পে ঘুমাচ্ছিল। বেশকিছু তাবু দিয়ে বানানো হয়েছে ক্যাম্প। হঠাৎ ফাঁড়ির কাছে একটি বিস্ফোরণ হলো। সচকিত হলো জাগ্রত সৈন্যরা। বিস্ফোরণের শব্দে কারো কারো ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সৈন্যরা কিছু বুঝে উঠার আগেই পর পর আরও দুতিনটি বিস্ফোরণ ঘটালো একই রকম। সৈন্যরা তাকিয়ে দেখলো তাদের কয়েকটি তাবুতে আগুন জ্বলে উঠেছে।

তিন চারটি তাবু তখন জ্বলছে। হতবিহবল সৈন্যরা ভয়ে তাবু ছেড়ে এদিক ওদিক পালাতে লাগলো। সৈন্যরা চিৎকার দিয়ে যখন ছুটাছুটি আরম্ভ করলো তখনই তাদের উপর চারদিক থেকে শুরু হলো তীর বর্ষণ।

প্রজ্জলিত তাবুর আলোতে সৈন্যদের ছুটাছুটি দেখা যাচ্ছিল। পেট্রোল ভর্তি জ্বলন্ত হাড়ি নিক্ষেপের ফলে জ্বলে উঠেছিল

আরো তাবু।
সুলতান আইয়ুবীর এক কমান্ডো বাহিনী এ আক্রমণ পরিচালনা করছে। তারা মেঞ্জানিক নিক্ষিপ্ত পেট্রোল হাড়ির আলোয় তীর মেরে ধরাশায়ী করছিল ভীতসন্ত্রস্ত খৃস্টান সৈন্যদের।
খৃস্টান সৈন্যরা তীর খেয়ে লুটিয়ে পড়ছিল। ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিল। তারা বুঝতে পারলো, সুলতান আইয়ুবীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছে তারা। এ যাত্রা বাঁচার আর কোন আশা নেই।
হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল তীর। কমান্ডো বাহিনীর কেউ একজন উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো, 'যদি বাঁচতে চাও তবে অস্ত্র সমর্পন করে এক দিকে সরে দাঁড়াও।'
অগ্নিশিখার তান্ডবলীলা চলছিল তাবুগুলোর ওপর। খৃস্টান সেনাদের বাঁচার কোন আশা ছিল না। কমান্ডো বাহিনীর ঘোষণা শুনে যারা তখনো বেঁচেছিল দু'হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পন করলো। কমান্ডোরা গুণে দেখলো, মাত্র জনাত্রিশেক সৈন্য লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে।
কমান্ডোরা খৃস্টান সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়াগুলো এক জায়গায় জড়ো করলো। জড়ো করা জিনিসগুলো পাঠিয়ে দেয়া হলো পেছনে। যখন সকালের সূর্য উদয় হলো তখন সেই পুড়ে যাওয়া ক্যাম্পের পাশে এসে দাঁড়ালো সুলতান আইয়ুবী অগ্রবাহিনীর প্রথম দলটি। তারা এখানে পৌঁছেই জানতে পারলো তাদের অগ্রাভিযানের পথ আরও বহু দূর পর্যন্ত নিরাপদ হয়ে আছে। গেরিলা বাহিনী ওখান থেকে আরো সামনে এগিয়ে

গিয়েছিল। তারা পথের পাশে দু'জন বা চার জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে ঝোপের মধ্যে বা টিলার ওপর কোন উঁচু পাথরের পিছনে বসে ওঁৎ পেতে থাকতো।

যখন কোন খৃস্টান অশ্বারোহী বা পদাতিক বাহিনী কাছে আসতো তখন অতর্কিত আক্রমণ করে বসতো তাদের ওপর। ওরা টের পাওয়ার আগেই বিষাক্ত তীরের আঘাতে পথের ওপর লুটিয়ে পড়তো আরোহী। কমান্ডোরা এগিয়ে গিয়ে সরিয়ে নিতো তার ঘোড়া।

খৃস্টানদের দশ বারো জনের দলকে এগিয়ে আসতে দেখলে মাত্র দু'জন কমান্ডোই এভাবে তীর মেরে তাদের ঘায়েল করে ফেলতো। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতো না হামলা করতে। কারণ তারা জানে, কোত্থেকে ছুটে এলো তীর তা বুঝে উঠার আগেই তাদের লাশগুলো লুটিয়ে পড়বে পথের ওপর।

কখনো কোন হুশিয়ার দলের ওপর আক্রমণ করতে গিয়ে দু'একজন কমান্ডো যে শহীদ বা আহত হতো না এমন নয়। কিন্তু এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটতো।

এভাবেই খন্ড যুদ্ধ চালাচ্ছিল কমান্ডোরা। তাদের কমান্ডার তাদের সাথে থাকতো না। কমান্ডোদের পথে পথে বসিয়ে দিয়ে তারা আরো সামনে এগিয়ে যেতো।

কমান্ডোরা এদিক ওদিক লুকিয়ে থেকে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিত কখন আক্রমণ করতে হবে। এ ব্যাপারে কারো পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ ছিল না তাদের, কিন্তু তাদের ট্রেনিংই ছিল তাদের পরিচালক।

তাদের বুদ্ধি ও বিবেকের সবগুলো দরজা তারা খুলে রেখেছিল। তাদের তৎপরতা বলছিল, প্রতিটি কমান্ডোই যেন একেকজন দক্ষ সেনাপতি।

হাতিনের যুদ্ধের পর সুলতান আইয়ুবী যে বড় শহরটি জয় করেছিলেন, সেখানেও মুসলমানদের অবস্থা তিনি সৈন্যদের দেখিয়ে ছিলেন। ক্ষুব্ধ চিত্তে তারা দেখছিল ধ্বংস হয়ে যাওয়া মসজিদ, কোরআনের অবমাননা। শুনছিল যুবতী মেয়েদের করুণ কান্না, শিশু ও বুড়োদের রোদনধ্বনি।

এ সব জনপদের মুসলমানদের চোখের চাহনিই বলছিল, এ যুদ্ধ কোন রাজা বাদশাহর রাজ্য লাভের যুদ্ধ নয়, এটা হচ্ছে নির্যাতীত মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। এ অনুভূতি প্রতিটি সৈনিকের ঈমানকে আরো সতেজ ও তরতাজা করে দিত।

আসকালান শহরে সুলতান আইয়ুবী রাতে তেমন ঘুমোনোর সময় পেতেন না। কারণ কমান্ডো বাহিনীর বিভিন্ন দলের সংবাদ নিয়ে একের পর এক কাসেদ আসতেই থাকতো। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকেও মাঝে মাঝে আসতো সেখানকার হুশিয়ার গোয়েন্দাদের পাঠানো রিপোর্ট। এদের অধিকাংশই আসতো রাতে। সুলতান আইয়ুবীর আদেশ ছিল, যে কোন সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই তা পৌছে দিতে হবে। তা সে গভীর রাত হোক বা তিনি ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় হোক।

যেহেতু কমান্ডোরা রাতের বেলাতেই বিভিন্ন ফাঁড়িগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে দখল করে নিতো সে জন্য রাতের বেলাতেই

কাসেদরা ছুটতো খবর নিয়ে। তারা সুলতানকে বলতো, অমুক স্থানে খৃষ্টানদের এক সেনা ফাঁড়িতে আক্রমণ চালানো হয়েছে। সেখানে এতগুলো শত্রু সেনা নিহত ও এত জন বন্দী হয়েছে। জানাতো, এই অভিযানে এতজন কমান্ডো হতাহত হয়েছে। রিপোর্টের আলোকে তিনি বুঝে নিতেন কতটুকু রাস্তা পরিষ্কার ও বাঁধা মুক্ত হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী সুলতান আইয়ুবী তাঁর নকশায় রেখা টেনে অভিযানের পথ চিহ্নিত করতেন এবং নিজের সৈন্যদের অগ্রাভিযানের নির্দেশ দিতেন।

আসকালানে বসেই সুলতান আইয়ুবী সেনাপতি ও কমান্ডারদের এক সম্মেলন ডাকলেন। এই সম্মেলনে নৌবাহিনীর এ্যাডমিরাল আল ফারেসকেও আহবান করা হলো।

আল ফারেসের কাছে যখন কাসেদ গিয়ে পৌঁছলো তখন তার জাহাজ আসকালান থেকে বিশ মাইল দূরে। ভূমধ্যসাগরের মাঝে অবস্থান নিয়ে তারা দৃষ্টি রাখছিল সমুদ্রের বিস্তীর্ণ এলাকায়।

নৌকায় করে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে কাসেদের মধ্যরাত পার হয়ে গেল। খবর পেয়ে আল ফারেস কাসেদের নৌকাতে করে রাতেই আসকালান এসে পৌঁছলেন।

কাসেদ তাকে বললো, 'সুলতান আইয়ুবী সমস্ত সেনাপতি ও কমান্ডারদেরকেই এ সম্মেলন ডেকেছেন।'

আল ফারেস বুঝে নিলেন, বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণের আগে এটাই হবে তাদের সর্বশেষ যৌথ সভা।

জাহাজ থেকে কাসেদের সাথে রওনা হওয়ার সময় তিনি মেয়ে দু'জনকে বললেন, 'আমি একটু আসকালান যাচ্ছি।'

'এত রাতে আসকালান কেন?'

'সুলতান ডেকেছেন।'

'কেন ডেকেছেন?' এক মেয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'আমার সরকারী দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করার তোমরা কে?' আল ফারেস তাদের বললেন, 'তোমাদের কত বার বলেছি, আমার ব্যক্তিগত বিষয় ছাড়া কখনো কোন প্রশ্ন করবে না।'

মেয়ে দু'জন হেসে ফেললো। বললো 'আপনার ব্যক্তিগত বিষয় ছাড়া আর কিছুর প্রতিই আমাদের কোন আকর্ষণ নেই। আপনি জাহাজে থাকলে আমরা পরম নিরাপত্তা বোধ করি। কিন্তু জাহাজ ছেড়ে আপনি কোথাও গেলেই আমাদের অন্তরে ভয় ঢুকে যায়।'

'আপনি বাইরে গেলে আমরা পেরেশান হয়ে পড়ি বলেই না আপনাকে এ সব প্রশ্ন করি।' অন্য মেয়েটি বললো, 'কখনো জাহাজ আক্রান্ত হলে কে আমাদের রক্ষা করবে?'

তার কথার খেই ধরে অপর মেয়েটি বললো, 'আফসোস! আমরা আপনাকে কোন সাহায্যই করতে পারছি না। নইলে আমাদের তো উচিত ছিল, আপনার অনুপস্থিতিতে এ জাহাজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকা। কখনো আক্রান্ত হলে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা। কিন্তু আমরা আপনার কোন কাজেই লাগতে পারলাম না।'

'তোমরা যে কাজের যোগ্য আমি সে কাজই তোমাদের কাছ

থেকে আদায় করে নেবো।' আল ফারেস বললেন, 'লড়াই নিয়ে দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই তোমাদের। আমার অনুপস্থিতিতে অধিকাংশ সময় নিজেদের কামরাতেই থাকবে। উপরে গিয়ে মাল্লা বা সৈন্যদের বিরক্ত করবে না।'

'আপনি কখন ফিরবেন?'

'সম্ভবত আজ রাতে আসতে পারবো না।' আল ফারেস বললেন, 'কাল সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসবো আশা করি।'

আল ফারেস মেয়ে দুটির সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গভাবে মিশে গিয়েছিলেন। তারা কৌশলে সুলতান আইয়ুবীর পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রায়ই জানতে চাইতো। কথায় কথায় তারা জানতে চাইতো, 'ভূমধ্যসাগরে মিশর ও সিরিয়ার নৌবহর কোথায় আছে? তারা কি বন্দরেই অবস্থান করছে নাকি সমুদ্রের গভীরে। ওদের জাহাজের সংখ্যা কত, নৌ সেনা কত?'

তারা এসব জানতে চাইতো গল্পচ্ছলে এবং আল ফারেসও অসতর্ক অবস্থায় এ সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে ফেলতেন। কখনো সতর্ক থাকলে বলতেন, 'এমন প্রশ্ন কখনো করো না আমাকে।'

কিন্তু এই নিষেধ মানলে তাদের চলবে কেন? তারা তাদের রূপের মাধুর্য দিয়ে, প্রেমের অভিনয় দিয়ে প্রায়ই এমন সব গোপন কথা তার কাছ থেকে বের করে নিতো।

এভাবে কখন যে আল ফারেস সেনাবাহিনীর অতি গোপনীয় বিষয়ও তাদের কাছে ফাঁস করে দিত টেরই পেতো না। কখনো টের পেলে সতর্ক হতো। কখনো এ ধরনের প্রশ্ন করার জন্য

ওদের সামান্য ধমকও দিত।

নেশায় ঘোরে মানুষ মনের সব গোপন কথা ফাঁস করে দেয়। নেশা, সেটা মদের হোক বা কোন ঔষুধের হোক। কিন্তু আলফারেস মদ পান করেন না। জাহাজে কোন মদ বা মাদক দ্রব্য রাখাও হয় না। আল ফারেস চরিত্রহীন ব্যক্তিও নন যে, তাকে কোনভাবে ফাঁসিয়ে দেয়া যাবে।

তার জন্য একটাই বিপদের কারণ, তিনি নিজেই নিজেকে মেয়েদের মায়ার বন্ধনে বন্দী করে নিয়েছেন। এই বন্ধন তার অবসাদ কিছুটা দূর করলেও এরই ফাঁক দিয়ে তার কাছ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল গোপন সংবাদ।

মেয়ে দুটি ছিল এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তারা দেখলো, আল ফারেসের মাঝে মদের নেশা নেই, কোন পশুত্বের ভাবও নেই। যদিও যৌবন আছে, সেই যৌবন শুধুই হৃদয়ের প্রেম ভালবাসায় সীমাবদ্ধ। সেখানে দেহের কোন ভূমিকা নেই।

তার ওপর আল ফারেস তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে এতই সচেতন ও দৃঢ় যে, দায়িত্বের ব্যাপারে তার সাথে কোন কথাই বলা যায় না। ফলে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ তাদের জন্য কঠিন হয়ে উঠলো। তারা বুঝতে পারলো, নারীর নেশা জাগিয়েও তাকে কাবু করা সহজ হবে না।

যে রাতে আল ফারেস সুলতান আইয়ুবীর ডাকে আসকালান গিয়েছিলেন সে রাতের ঘটনা। মেয়ে দুটি তাদের কেবিন থেকে বেরিয়ে উপরে চলে গেল। উপরে জাহাজের কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওরা সমুদ্রে চাঁদের আলোর প্রতিফলন দেখছিল।

সমুদ্রে চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছিল, তাদের মনে হচ্ছিল যেন মতি চমকাচ্ছে। এমন মনকাড়া দৃশ্যের দিকে তারা আপন মনে তাকিয়ে রইলো।

'রোজী!' এক সময় এক মেয়ে অন্য জনকে বললো, 'এখনতো আমাদের ভবিষ্যত একদম অন্ধকার। আল ফারেসকে আসলে মোমের মত নরম মনে হলেও দায়িত্বে সে পাথরের মত শক্ত। আমার মনে হয় আমরা এখানে কোন কাজ করতে পারবো না। এন্ডু আস্‌লে বরং তার সঙ্গে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু ভাবছি, এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে?'

এন্ডু হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ছোট নৌকায় খাদ্য-পানীয়; ফলমূল ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করার নাম করে জাহাজের কাছে আসে এবং মেয়ে দুটির সাথে দেখা করে। এ লোক খৃস্টান গোয়েন্দা কমান্ডার। ঘটনাক্রমে মেয়ে দুটির সাথে তার সাক্ষাত হয়ে যায়।

সে দরিদ্র ফেরিওয়ালার বেশে ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে জাহাজে ফলমুল বিক্রি করতে এসে মেয়েদের দেখে চিনে ফেলে। ছদ্মবেশের কারণে মেয়েরা প্রথমে তাকে চিনতে না পারলেও সে ইশারায় তাদের সাথে মত বিনিময় করে এবং ফলমূল বিক্রির ছলে মেয়েদের সাথে দেখা করে।

সে মেয়েদের জানায়, এই জাহাজের পিছনে সে ছায়ার মত লেগে আছে। সুযোগ পেলেই জাহাজ ধ্বংস করে দেবে। মেয়ে দুটি তাকে জানায়, কিভাবে তারা আল ফারেসের হাতে পড়লো। খৃস্টান গোয়েন্দা কমান্ডার গোয়েন্দাগিরীর স্বার্থে

তাদেরকে জাহাজেই থাকার পরামর্শ দিয়ে প্রথম বার বিদায় নিয়েছিল।

প্রথম সাক্ষাতের পর সে আরো দু'বার ছদ্মবেশে জাহাজে এসেছে ও মেয়েদের সাথে কথা বলেছে। মেয়েরা তাকে জানিয়েছে, 'আল ফারেস আমাদের জালে ধরা দিচ্ছে না আর কোন গোপন তথ্যও দিচ্ছে না।'

'এই জাহাজগুলো আর কতদিন এখানে ডিউটিতে থাকবে? এ জাহাজ কি টায়েরের দিকে যাবে?' জানতে চায় এন্ড্রু।

মেয়েরা এ ব্যাপারে তাকে কোন তথ্য দিতে অপারগ হলে সে মেয়েদের বলে, 'মনে হচ্ছে তোমরা হরমুনের শেখানো সব কৌশলই ভুলে গেছো? আরে, এ জাহাজে কেবল আল ফারেসই থাকে না, তার সহকারীরাও থাকে।

আল ফারেসকে ফাঁসাতে না পারলে তার নিচের যে কোন একজন অফিসারকে ফাঁসিয়ে নাও। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করো। আল ফারেসের সহকারীদের যাদেরকে সম্ভব তার শত্রু বানিয়ে দাও। কাজের কি কোন অভাব আছে? বুদ্ধি খাটাও, কাজ করো।' সে ওদের বললো, 'তোমাদের রূপ আর যৌবনের যে অস্ত্র আছে তা ঠিক মত ব্যবহার করতে শেখো। নিশ্চয়ই যাদুর মোহে কাউকে না কাউকে অন্ধ করতে পারবেই। এত কৌশল শেখার পর এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কি কোন মানে হয়?'

সেই রাতেই এক মেয়ে অপর মেয়েকে নিরাশ হয়ে বলছিল, 'রোজী! এন্ড্রু আস্‌লে বরং তার সঙ্গে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু

ভাবছি, এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে?'

'শোন ফ্লোরী!' রোজী তাকে বললো, 'এন্ড্রু এখান থেকে আমাদের বের করতে পারবে না। এটা যুদ্ধ জাহাজ! তুমি দেখতে পাচ্ছো রাতেও ছাদে, জাহাজের মাস্তুলে সর্বত্র নৌ সেনারা পাহারায় থাকে। এন্ড্রুর সহযোগিতায় পালানোর চেষ্টা করলে এন্ড্রুই বরং ধরা পড়ে যাবে। আমাদের এখুনি নিরাশ হওয়ার দরকার নেই। বরং পালাতে হলে আমাদের অন্য পথ বের করতে হবে।'

'তবে অন্য পথই বেছে নাও।' ফ্লোরী বললো, 'বলো, তাহলে এখন কি করবো?'

'কি করবে? শোন তাহলে।' রোজী বললো, 'আল ফারেসের সহকারী ক্যাপ্টেনকে দেখছি সে প্রায়ই ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকায় ও হাসে।'

রোজী বললো, 'এরা দীর্ঘদিন ধরে সাগরে পড়ে আছে। এদের মাথার উপর খেলা করছে মৃত্যু। খোদা পুরুষের মধ্যে নারী সঙ্গ লাভের যে দুর্বলতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন সে দুর্বলতা সব পুরুষেরই আছে। কেউ খোদার ভয়ে নিজেকে সামলে রাখে, কেউ পায় না বলে খায় না।

সহকারী ক্যাপ্টেনের অবস্থা আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, সে দ্বিতীয় দলের। আমার মনে হয়, শুধু ইঙ্গিতটুকু পেতে যা দেরী, সে নিজেকে আমাদের হাতে সঁপে দিতে মোটেও দ্বিধা করবে না। এখন বলো, কাজটা আমি করবো, না তুমি? তবে আমার

চেয়ে এ কাজের ট্রেনিং ও দক্ষতা তোমার ভাল আছে।'

'তুমি বললে কাজটা আমিই করতে পারবো।' ফ্লোরী বললো।

'কিন্তু কাজের সময় এ কাজের নিয়মটা মনে রাখবে।' রোজী বললো, 'তার কাছ থেকে গোপন তথ্য যা জানার সব জেনে নেবে কিন্তু মূল্যটা পরিশোধ করবে না। নাকের ওপর মূলা ঝুলিয়ে দিয়ে সরে আসবে, যাতে তার আগ্রহ ও উন্মাদনায় ভাটা না পড়ে। তুমি সে লোকের মধ্যে উষ্ণতা ও উন্মাদনা এমনভাবে জাগিয়ে তুলবে, যাতে সে তোমার ইশারায় আল ফারেসকে হত্যা করতেও পিছপা না হয়। তাকে বুঝাবে, আল ফারেস বেঁচে থাকলে এবং তোমাদের সম্পর্ক জানতে পারলে সে তোমাদের কাউকে রেহাই দেবে না।

অতএব আল ফারেস বেঁচে থাকলে তুমি তার হওয়ার দুঃসাহস করতে পারো না। যদি সে তোমাকে সত্যি চায় তবে তা সে কেবল তখনি পেতে পারে, যখন এ দুনিয়ায় আল ফারেস থাকবে না।'

আল ফারেসের এই সহকারীর নাম ছিল আবদুর রউফ কুর্দী। সে ছিল কুর্দিস্তানের সন্তান এবং বেশ চালাক চতুর যুবক। সে মেয়ে দুটিকে দেখলেই তাদের দিকে তাকিয়ে অন্তরঙ্গ হাসি দিত। সে জানতো, এরা আল ফারেসের স্ত্রী নয়, দাসীও নয়। এরা যাযাবর মেয়ে। আল ফারেস এদেরকে জাহাজে আশ্রয় দিয়েছেন।

রউফ কুর্দীর মনে মেয়ে দুটির জন্য এক ধরনের আকর্ষণ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উর্ধতন অফিসারের আশ্রিতা বলে সে

ওদের দিকে হাত বাড়াতে সাহস পাচ্ছিল না।

সেই রাতে, যখন মেয়েরা জাহাজের ছাদে উঠে কার্নিশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, রউফ তখন পাহারাদারদের ডিউটি তদারক করার জন্য টহলে বেরিয়েছে। সে জানতো না, মেয়েরা ছাদে দাঁড়িয়ে রাত্রিকালীন সমুদ্রের নৈসর্গিক শোভা দেখছে।

রউফ কুর্দী ছাদে উঠলো। দেখলো চাঁদের আলোয় জাহাজের কার্নিশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে দুই অনিন্দ্য অপ্সরী।

আল ফারেস সুলতান আইয়ুবীর আহবানে চলে গেছেন আসকালান। জাহাজের দায়িত্ব এখন রউফ কুর্দীর ওপর।

রোজী রউফ কুর্দীকে দেখেই কামরার দিকে হাঁটা ধরলো। ফ্লোরী জাহাজের ছাদে কার্ণিশ ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

রোজী হাঁটতে হাঁটতে রউফ কুর্দীর পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, রউফ কুর্দী তার দিকে তাকিয়ে সেই অন্তরঙ্গ হাসি দিয়ে বললো, 'রাতের সমুদ্র দেখছিলেন?'

রোজী না থেমেই বললো, 'হ্যাঁ।'

রউফ কুর্দী বললো, 'একটু দাঁড়াবেন?'

থমকে দাঁড়ালো রোজী। রউফ কুর্দীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'না। আমি যদি আপনার পাশে দাঁড়াই তবে আরেকজন অসন্তুষ্ট হবে। আমি কাউকে অসন্তুষ্ট করতে চাই না।'

রউফ কুদী অবাক হয়ে বললো, 'কে অসন্তুষ্ট হবে?'

রোজী আঙুল দিয়ে ফ্লোরীর দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।'

রউফ কুর্দী আরো অবাক হয়ে বললো, 'কেন, অসন্তুষ্ট হবে

কেন?'

'সে প্রত্যেকের নিজ নিজ মনের ব্যাপার।' রোজী বললো, 'একদিন আল ফারেস নিচে ক্যাবিনে শুয়েছিল আর আমি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেই অবস্থায় ও আমাদের দেখেছিল।

পরে যখন তার কাছে গেলাম তখন সে আমাকে বললো, 'তুমি তো আল ফারেসকে দখল করে নিয়েছো। তুমি থাকলে আল ফারেসের কাছে আমার কোন দাম নেই। আমি তোমার অধিকারে কোনদিন ভাগ বসাতে যাইনি। আমার নিঃসঙ্গতা দেখো। আমার এই নিঃসঙ্গ জীবন আমি একজনের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম, সেখানেও তুমি হাত বাড়াবে? আমি তো অবাক! বললাম, 'কার দিকে তাকিয়ে?' সে বললো, 'রউফ কুর্দী। রউফ আমার। খবরদার, আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না। তারপর থেকে আমি আর আপনার কাছে যাইনি।'

'কিন্তু সেও তো আমার কাছে আসেনি?'

'আল ফারেসের ভয়ে সে আপনার কাছে যায়নি, যদি আল ফারেস অসন্তুষ্ট হয়?' রউফের বুকের ভেতর শুরু হলো অদ্ভুত এক ভূকম্পন। তার জীবনে এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি। কোন মেয়ে তাকে স্বপ্নপুরুষ ভাবে মনে হতেই এক অদ্ভুত তৃপ্তিবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার হৃদয়।

পুরুষের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে অন্তর থেকে তখনই সে আত্মসমর্পন করলো ফ্লোরীর প্রেমে।

সে জীবনে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে কিন্তু হৃদয় ব্যাকুল করা আকর্ষণ আর কারো মধ্যে খুঁজে পায়নি। সে যখন জানতে পারলো, এই দুই রূপসীর একজন তাকে ভালবাসে তখন তার আবেগের নদীতে বান ডাকলো।

সেই বানের তোড়ে সে ভেসে চললো সেই পথে, প্রেমে পড়লে মানুষ যে পথে ভেসে যায়। এ এমন এক পথ, যে পথে ভেসে যাওয়া যায়, কিন্তু সেই স্রোতে পড়ে গেলে সেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না।

রোজী তাকে তার যাদুর পরশে জ্ঞানশূন্য করে দিয়ে চলে গেল। সে নিজের ক্যাবিনে ফিরে যেতে গিয়ে সিঁড়িতে পা দিয়ে তাকালো পিছন দিকে, দেখলো, রউফ কুর্দী ধীরে ধীরে ফ্লোরীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'আজ রাতে ঘুমাবে না জোশী?' রউফ ফ্লোরীর নাম জোশী বললো, কারণ এ নামেই আল ফারেস তাকে ডাকতো। রোজী এ নামেই আল ফারেসের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। আর সে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিল, 'আমার নাম মীরা।' রোজীর ধারনা ছিল, আরব বেদুইন মেয়েদের এ ধরনের নামই পছন্দ হবে মুসলিম সৈনিকদের।

রউফ কুর্দী তার পাশে এসে দাঁড়াতেই ট্রেনিং অনুসারে সে এমন ভঙ্গিতে লজ্জার ভান নিয়ে হাসলো যে, এমন লজ্জা কোন কুমারী বা নববধুও পায় না। সে একেবারে জড়োসড়ো হয়ে কার্নিশের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে রইলো। রউফ বললো, 'কি ব্যাপার! আমি এখানে আসায় তুমি খুশী হওনি?'

মেয়েটি এ কথার কোন জবাব না দিয়ে আরো জড়োসড়ো হয়ে গেল। রউফ তাকে আশ্বস্ত করার জন্য তার কাঁধে আলতো করে হাত রেখে বললো, 'মীরা তোমার সম্পর্কে আমাকে কিছু কথা বলেছে। তার এ সব কথা কি সত্যি?'

ফ্লোরী তার দিকে পলকের জন্য তাকালো। ঠোঁটে ক্ষীণ চাঁদের বাঁকা হাসি। মুহূর্তেই লজ্জায় আরক্ত হয়ে মাথা নত করে সমুদ্রের অথৈ পানির দিকে তাকিয়ে রইলো।

রউফ কুর্দী নিচু স্বরে বললো, 'কথা বলো। সত্যি করে বলো, মীরা যা বলেছে তা কি সত্যি?'

ফ্লোরী এবারও কোন কথা বললো না। রউফের এক হাত আলতো করে স্পর্শ করে ছিল ফ্লোরীর কাঁধ, অন্য হাতটি ছিল জাহাজের কার্নিশে। ফ্লোরী তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে নিজের কোমল হাত দিয়ে সেই হাতটি স্পর্শ করলো এবং নিজের আঙ্গুলগুলো রউফের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

এটুকু স্পর্শেই রউফের জবান বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তে সে একজন সৈনিক থেকে বনে গেল এক মুগ্ধ প্রেমিকে। এখন সে আর আইয়ুবীর সৈনিক নেই, ফ্লোরীর প্রেম ভিখারী এক তৃষ্ণার্ত প্রেমিকে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

একটু পর। জাহাজের ছাদে এসে পড়ছিল অবারিত চাঁদের আলো। সমুদ্রের পানিতে খেলা করছিল রূপালী জোসনা। ফ্লোরী ও রউফ পাশাপাশি বসেছিল ছাদের ওপর।

তাদের একজনের হাতের ওপর অন্য জনের হাত। কখনো নিচু স্বরে ওরা কথা বলছিল। কখনো নিস্তব্ধতার সমুদ্রে ডুবে গিয়ে

কথা বলছিল পরস্পর হৃদয়ের সাথে।

জাহাজ নোঙ্গর করা ছিল তীর থেকে যথেষ্ট দূরে। কয়েকটি সার্চলাইটের আলো সমুদ্রের পানিতে ঘুরাফেরা করছিল। এ আলোগুলো আল ফারেসেরই বহরের বিভিন্ন জাহাজের ছিল। আলোগুলো টহল দিচ্ছিল সমুদ্রের ঘোলা জলে।

মাঝ রাত পেরিয়ে গেল। রউফ কুর্দী ফ্লোরীকে বললো, 'তুমি আমার ক্যাবিনে চলে যাও। আমি পরে আসছি।' ফ্লোরী চলে গেল। জাহাজের ছাদে যখন ফজরের আজান হলো তখন ফ্লোরী রউফের ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে নিজের ক্যাবিনে চলে গেলো।

রাতে সে আল ফারেসের সহযোগী রউফকে বলেছে, 'আমি তোমাকে মনে প্রাণে ভালবেসে ফেলেছি। আল ফারেস মীরাকে ভালবাসে। আমি কখনও আল ফারেসকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবো না। আমি কারো দ্বিতীয় স্ত্রী হতে চাই না।'

সে রউফ কুর্দীকে আরও বললো, 'আল ফারেসই তোমার প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন, 'রউফ কুর্দীর সাথে কোন কথা বলবে না, লোকটা ভীষণ খারাপ।'

এ কথা শোনার পর তোমার প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে যায়। কারণ আমি ভেবে দেখলাম, আসলে তিনি নিজেই খুব খারাপ লোক। তিনি আমাদের আশ্রয় দিয়ে আমাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিচ্ছেন আর এক সাথে আমাদের দু'জনকে ভোগ করতে চাচ্ছেন।

কেন, মীরাকে তোর ভাল লাগলে তাকে তুই বিয়ে কর। এক সাথে দুইজনকে বিয়ে করার লোভ কেন? মেয়ে মানুষ দেখলেই তার দিকে হাত বাড়াতে হবে? আমি ওকে বলেছি, 'দু'জনকে তুমি এক সাথে পেতে পারো না। আগে ঠিক করো কাকে গ্রহণ করবে।' তাতেই সে আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

যদি আমরা অসহায় না হতাম তবে সে আমাদের কাছে এত বেশী মূল্য চাইতে পারতো না। তুমিই বলো, যেখানে প্রেম ভালবাসা নেই সেখানে শরীরের কি দাম? আমরা কি তবে তার হাতের খেলনা পুতুল?'

রউফ কুর্দীর মনে ভালবাসার ছলনা ও আল ফারেসের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করে তার ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো ফ্লোরী। আল ফারেসের কাছ থেকে যে সব গোপন তথ্য এতদিন সংগ্রহ করতে পারেনি সে সব তথ্য রউফ কুর্দীর নিকট থেকে সহজেই পেয়ে গেল সে।

সে রাতে সুলতান আইয়ুবী মোটেই ঘুমাতে পারেননি। সমস্ত রাত তাঁর আলোচনা সভাতেই কেটে গেল। এবার তিনি আর এমন কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে চান না, যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের অবরোধ ও অভিযান ব্যর্থ হতে পারে।

তিনি সেনাপতি ও কমান্ডারদের বায়তুল মোকাদ্দাস অভিযানের সুবিধাজনক রাস্তার নকশা দেখিয়ে দিলেন। কোথায় কোথায় খৃস্টানদের সৈন্য ফাঁড়ি (Out post) আছে সেগুলো চিহ্নিত করে

জানিয়ে দিলেন তাদের।

যেখানে খৃস্টানদের শক্ত কেল্লা ও ঘাঁটি আছে সে সব জায়গা দেখিয়ে সুলতান আইয়ুবী সকলকে বললেন, 'এগুলো আক্রমণের প্রয়োজন নেই, কারণ এগুলোর পিছনে শক্তি ক্ষয় করে দুর্বল হতে চাই না।'

তিনি বললেন, 'এ সব ঘাঁটি খুব উঁচু স্থানে। আমরা এগুলো পাশ কাটিয়ে দূর দিয়ে এগিয়ে যাবো। ওখানে যে সব সৈন্য আছে তারা শান্তিতে বসে থাক। তারা দেখলেও অল্প সৈন্য নিয়ে আমাদের পথে বাঁধা দিতে আসবে না।'

'কিন্তু দূর থেকে দেখে তাদের সংবাদাতারা বায়তুল মোকাদ্দাস গিয়ে সংবাদ পৌঁছাবে।' এক সেনাপতি বললো, 'তবে তো আমরা বায়তুল মোকাদ্দাসে গোপনে অতর্কিত আক্রমণ চালাতে পারবো না।'

'গোপনে যাওয়ার আশা অন্তর থেকে দূর করে দাও।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'খৃস্টান বাহিনী ভাল করেই জানে, আমরা বায়তুল মোকাদ্দাস যাচ্ছি।'

তাদের যুদ্ধের গতিই বলে দিচ্ছে, এবার তারা বাইরের ময়দানে এসে যুদ্ধ করবে না। শহরে তাদের যে সৈন্য আছে তারা শহর রক্ষার কাজে নিয়োজিত। বাইরে এসে যুদ্ধ করার অভ্যাস তাদের নেই। এমন ঝুঁকি নিতেও তারা প্রস্তুত নয়।

সেখান থেকে আমাদের গোয়েন্দারা সংবাদ এনেছে, সেখানে সৈন্য বাহিনী প্রতিরক্ষার কৌশল আয়ত্ব করছে। তারা সেই ট্রেনিং নিয়েই ব্যস্ত।

আরো খবর এসেছে, আমরা যে সকল স্থান দখল করেছি সেখানকার কিছু পলাতক সৈন্য গিয়ে সেখানে সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়েছে। তাদের মধ্যে লৌহ পোষাকধারী কিছু নাইটও আছে। আমাদের গোয়েন্দারা আরো জানিয়েছে, অবরোধ কালে এসব নাইটরা বাইরে এসে যুদ্ধ করবে।

তারা এরই মধ্যে শহরের বাইরে এসে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। তারা 'আঘাত করো ও পিছু হটো' এ নীতিতে আমাদের ওপর আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুদ্ধের এ কৌশল তারা আমাদের কাছ থেকেই শিখেছে।

সুতরাং একথা মনে করার কোন অবকাশ নেই যে, শত্রুর উপর আমরা অজান্তে আক্রমণ করতে পারবো। শত্রুরা আমাদের অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আমিও কিছু ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছি।

খৃষ্টানদের কোন ফাঁড়ি থেকেই কোন লোক সংবাদ নিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস যেতে পারবে না। তাদের সকল ফাঁড়ি থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস যাওয়ার প্রতিটি পথে আমাদের সতর্ক কমান্ডো বাহিনী ওঁৎ পেতে বসে আছে।

তারা চারদিকে সতর্ক নজর রাখছে। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোন সংবাদই বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছতে পারবে না বলে আশা রাখি। কমান্ডোরা এ ধরনের সংবাদ বাহকদের কাউকেই জীবিত রাখবে না।'

'শত্রু সেনাদের সংখ্যা সম্পর্কে গোয়েন্দাদের রিপোর্ট কি?' এক সেনাপতি জানতে চাইলো।

'শত্রু সেনাদের সংখ্যা সম্পর্কে গোয়েন্দারা বিভিন্ন সংবাদ এনেছে। তাদের রিপোর্ট থেকে আমি যেটুকু অনুমান করতে পেরেছি তা হলো, বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যে হিসাব মতে তাদের সৈন্য সংখ্যা ষাট হাজারের কিছু বেশী হবে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, সেখানকার মুসলমানরা এখন বন্দী বা নজরবন্দী অবস্থায় আছে। তারা ভেতর থেকে আমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। অন্যদিকে খৃষ্টান নাগরিকরা তাদের সৈন্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে পারবে। তারা এটাকে ধর্মযুদ্ধ মনে করে। ফলে তারা এই অবরোধ ঠেকিয়ে দেয়ার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করবে।

আমি আরো খবর পেয়েছি, খৃস্টানরা তাদের নারী এবং শিশুদেরও যুদ্ধের ট্রেনিং দিচ্ছে। শহরের প্রাচীরের ওপর থেকে তারা মুষলধারে তীর বর্ষণ করবে।

আরো খবর পেয়েছি, খৃস্টানরা তীর বর্ষণের জন্য দক্ষ এক কমান্ড গঠন করেছে। তারা নতুন এক ধরনের তীরও আবিষ্কার করেছে, যে তীর অনেক দূরে চলে যায় এবং সঠিকভাবে লক্ষ্য ভেদ করে।'

সুলতান আইয়ুবী সকলকে নকশায় রাস্তা ও আক্রমণের লক্ষ্যস্থলগুলো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'আমাদের আক্রমণ হবে ঝড়ের মত বেগবান কিন্তু অত্যন্ত সুশৃংখল থাকবে আমাদের বাহিনী।'

তিনি অবরোধের কর্মকৌশল ও পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর বললেন, 'এটাই আমাদের শেষ অধিবেশন। যদি

কারো কিছু বুঝতে বাকি থাকে তবে এখনই বুঝে নাও। মনের ভেতর কেউ কোন প্রশ্ন জমা করে রাখবে না। আর প্রশ্ন যত তুচ্ছই হোক তাকে কখনোই তুচ্ছ মনে করবে না।'

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সুলতান আইয়ুবী এ সম্মেলন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই হাদিসটি বর্ণনা করে শেষ করেন, 'যাদের জন্য সফলতার দুয়ার খুলে যায় তাদের জলদি সেখানে প্রবেশ করা উচিত। কেউ জানে না, সে দরজা কখন বন্ধ হয়ে যাবে।'

সুলতান আইয়ুবী অতি দ্রুত খৃস্টান অধিকৃত অঞ্চল ও কেল্লাগুলোতে তার দখল প্রতিষ্ঠা করে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু তাই বলে এ কথা বলার উপায় নেই যে, বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণের দুর্বল পরিকল্পনা নিয়ে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন।

দুরন্ত বেগে আক্রমণ করা আর আক্রমণের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা এক কথা নয়। তিনি এগুচ্ছিলেন পরিকল্পিতভাবে কিন্তু দুর্বার বেগে। তিনি বলতেন, 'আল্লাহ আমাদের জন্য সফলতার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। বন্ধ হওয়ার আগেই সেখানে প্রবেশ করতে হবে।'

'হে আমার বন্ধুগণ।' তিনি নকশাটি সরিয়ে রেখে বললেন, 'হাত্তিনের যুদ্ধের আগে আমি তোমাদের বেশ কিছু উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছিলাম। তার কিছু কথা আবার বলা দরকার। কারণ এর পরে আমি হয়তো আর কোন কথা বলার সুযোগ পাবো না। কেউ বলতে পারে না, আমরা আবার সকলকে ও একে

অপরকে জীবিত দেখতে পাবো কিনা।

এর আগে আমরা অনেক যুদ্ধ করেছি। গৃহযুদ্ধে একে অপরের রক্ত প্রবাহিত করেছি। আর এই করতে গিয়ে শত্রুদের আমরা অনেক সময় ও সুযোগ দিয়েছি। এর ফলেই তারা মুসলমান এলাকায়ও তাদের ঘাঁটি করার সুযোগ পেয়েছে। সেই কেল্লা মজবুত করারও সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগে তারা বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতিরোধ শক্তি আরও মজবুত করে নিয়েছে। তবুও আমরা শেষ মিমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য জীবন মরণ যুদ্ধ চালাতে এসেছি।

তোমরা জানো, ইহুদী ও খৃষ্টান মেয়েদের অভিনয় ও প্রেমের ছলনায় আমাদের অনেক দক্ষ সেননায়ক ও কমান্ডার ধরাশায়ী হয়েছে। তাদের চক্রান্তের জালে আটকা পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের শাসকদের এক বিরাট অংশ। তাই অস্ত্রের লড়াইয়ের চাইতে সাংস্কৃতিক লড়াইকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই আমাদের।

আলী বিন সুফিয়ান, গিয়াস বিলকিস্ ও তাদের গোয়েন্দা সংস্থা অসংখ্য ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে নিজেদের প্রাণের নজরানা দিয়ে বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তাদের দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, সৃজনশীলতা, আপোষহীনতা, দেশপ্রেম ও ঈমানের মজবুতি সবই আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

তারা আমাদের জন্য রণাঙ্গনের পথ সহজ করে দিয়েছে। তারা সময় মতো আমাদের চোখ কান খুলে দিয়ে আমাদের রক্ষা করেছে বিপর্যয়ের গর্ত থেকে।

তারা আমাদের মধ্যে যে উঁইপোকা আছে তাদের সনাক্ত করে দিয়েছে। তাদের দেয়া তথ্য যাচাই বাছাই করে আমার আমাদের অনেক যোগ্য শাসক, দক্ষ সেনাপতি, অভিজ্ঞ অফিসার, সাহসী কমান্ডারকে গাদ্দারীর জন্য চরম শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের মাঝে বিদ্রোহ হয়েছে, আমরা সে বিদ্রোহ নির্মম হস্তে দমন করেছি।

বন্ধুরা, অস্ত্র নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। আগে জানতে হবে শত্রুর উদ্দেশ্য কি? জানতে হবে কোন পথে কিভাবে তারা আমাদের ঈমান ও আকীদার ওপর হামলা চালাচ্ছে। তারপর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে তার মোকাবেলা করতে হবে।

একেই বলে জিহাদ। আর এই জিহাদ প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। আমাদের এই জিহাদ চলবে রাজনৈতিক ময়দানে। জিহাদ চলবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ময়দানে। তাদের কুটনৈতিক তৎপরতার মোকাবেলা করতে হবে পরিচ্ছন্ন কুটনৈতিক তৎপরতা দিয়ে।

সময়ের গতিধারায় তারা নিত্যনতুন যত সেক্টর খুলবে প্রতিটি সেক্টরেই লড়াইয়ে নামতে হবে আমাদের। এটাই একজন মুজাহিদের কাছে আজকের সময়ের দাবী।

তারা নিত্যনতুন ইজম বা মতবাদ দিয়ে আমাদের বিশ্বাসে ফাটল ও ভাঙ্গন ধরাতে চাইবে। আমাদের আগামী দিনের নাগরিকদের বিলাসপ্রিয় ও আরামে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য তারা জঘন্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।'

তিনি বললেন, 'শত্রুরা অতীতের মত ভবিষ্যতেও আমাদের ঈমান ক্রয়ের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাবে। আমাদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি করবে বেঈমান ও গাদ্দারের বাহিনী।

এই গাদ্দারদের সহযোগিতার ফলেই তারা এতদিন ধরে আমাদের প্রথম কেবলার উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হয়েছে। বেঈমান ও দালালদের সহযোগিতায় তারা মক্কা মুয়াজ্জামা এবং মদীনা মনোয়ারাও দখল করার চেষ্টা করেছে।

অতএব যতটুকু সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে শত্রুর দিকে ততটুকু দৃষ্টি রাখতে হবে নিজেদের দিকেও। কিছুতেই গাদ্দার সৃষ্টির বীজ বুনতে দেয়া যাবে না দুশমনকে।

আমি আশা করি, তোমরা এখনও ভুলে যাওনি, পাঁচ বছর আগে যখন আমি উত্তরাঞ্চলে শত্রুদের সাথে যুদ্ধে আটকে ছিলাম, তখন ত্রিপোলীর সম্রাট রিনাল্ট ও আক্রার সম্রাট আরনাত মদীনা মনোয়ারা থেকে মাত্র চার মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সে সময় আমার ভাই তকিউদ্দিন ও এ্যাডমিরাল হেশামুদ্দিন লুলু যে সাহসিকতার প্রমাণ দিয়েছে সে জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা যথাসময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ক্রুসেড বাহিনী পিছু হটাতে বাধ্য হয়। আমি সম্রাট আরনাতকে নিজ হাতে হত্যা করে এর প্রতিশোধ নিয়েছি।

শত্রুদের উদ্দেশ্য, আমাদেরকে ধর্মের উৎসমূল থেকে দূরে রাখা এবং খৃস্টান ধর্মের উৎস গ্রহণে আমাদের বাধ্য করা। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য হবে নিজের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে শত্রুর লক্ষ্য ও পরিকল্পনাকে সমুলে ধ্বংস করা। সুতরাং এ যুদ্ধ

কেবল জেরুজালেম জয়ের যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ আদর্শের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ আমাদের বিশ্বাস ও চেতনা সংরক্ষণের যুদ্ধ।

আমাদের ধর্ম তলোয়ারের জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, প্রেম ও মানবিকতার আকর্ষণেই অধিকার বঞ্চিত, মানবতা বঞ্চিত মানুষ এ ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু মানুষের ওপর প্রভুত্বকামী লোকেরা এটা মেনে নিতে পারেনি। তারা গরীবের আশ্রয়, নিরন্নের আশ্রয়, সভ্যতার আশ্রয় এই ধর্মকে দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য বার বার অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এর অনুসারীদের ওপর। ফলে সভ্যতা ও মানবতা রক্ষার স্বার্থে বার বার এ ধর্মের অনুসারীদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হয়েছে। তাই আমি মনে করি, ধর্মকে রক্ষা করার জন্য আজো আমাদের তলোয়ারের শক্তির প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ তলোয়ার ব্যবহৃত হবে কেবলমাত্র পশুশক্তির বিরুদ্ধে। যেখানে মানবতা লাঞ্ছিত হবে সেখানেই গর্জে উঠবে মুজাহিদের তলোয়ার।

জাতি শুধু সৈন্যদের হাতেই তলোয়ার দিয়ে রেখেছে। অতএব এ জাতির নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদেরকেই বহন করতে হবে। জাতির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে করুণ নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া ওরা আর কিইবা করতে পারে! তাই জাতির দৃষ্টি এখন আমাদের দিকে।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতও তাঁর মহব্বতের দৃষ্টি এ জাতির মুজাহিদদের প্রতিই নিবদ্ধ রেখেছেন। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের পবিত্র আত্মাও তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। এখন চিন্তা করো, আমাদের দায়িত্ব ও জিম্মাদারী কত বড়, কত পবিত্র ও

কত মহান।

আমরা আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহর সৈন্যরা কখনো শাসন ক্ষমতা ও গদীতে বসে থাকে না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহর এ দুনিয়ায় আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং তা অটুট রাখার জন্য বদ্ধপরিকর থাকা।'

সুলতান আইয়ুবী সামান্য বিরতি নিলেন। তারপর তিনি আবার বক্তব্য দিতে শুরু করলেন। 'হায় আমার বন্ধুরা! ষোল হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের কথা তোমরা স্মরণ করো। যখন উমর বিন আস (রা.) ও তার সাথী সেনাপতিরা বায়তুল মোকাদ্দাস কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন।

আমিরুল মোমেনীন হযরত উমর (রা.) তখন মুসলিম জাহানের খলিফা। এই খোশখবর পেয়ে তিনি নিজে বায়তুল মোকাদ্দাস ছুটে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত বেলাল (রা.)। তিনি মসজিদুল আকসায় সকল মুসলমানদের নিয়ে নামাজ পড়লেন। সেখানে দীর্ঘদিন হযরত বেলালই (রা) আজান দিয়েছিলেন।

হযরত বেলাল (রা.) রাসুলুল্লাহর (সা.) ওফাতের পর এমন নিরব হয়ে গেলেন যে লোকে তার সুর ভুলতে বসেছিল। কারণ তিনি আজান দেয়া একরকম বাদই দিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মসজিদুল আকসায় এসে যখন হযরত উমর (রা.) তাঁকে বললেন, 'বেলাল! মসজিদুল আকসা, এর দরজা জানালা ও বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রাচীর দীর্ঘকাল ধরে কোন আজান শোনেনি। মুক্ত বায়তুল মোকাদ্দাসে কি তুমি আজান দেবে না?'

হুজুর (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত বেলাল (রা.) সেই প্রথম আজান দিলেন। যখন তিনি করুণ কান্নার সুরে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বললেন, তখন উপস্থিত সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমরা এই যুগেও মসজিদুল আকসায় সেই আজানের সুর আবার উচ্চকিত করতে চাই। নব্বই বছরের মত সময় ধরে এই মসজিদ আজানের প্রতীক্ষায় কোন মুয়াজ্জিনের পথ পানে চেয়ে আছে। তোমরা মনে রেখো, মসজিদুল আকসার আজান বিশ্বের সমস্ত প্রান্তরে আবার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলবে।

খৃস্টানরা এ মসজিদের আজান গলা টিপে বন্ধ করে রেখেছে। এই পবিত্র লক্ষ্যকে সামনে রাখো। আমরা কোন সাধারণ যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না, আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যে ইতিহাস হযরত উমর (রা.) ও তার সঙ্গীগণ লিখে গিয়েছেন।

তাদের পরে অবসাদগ্রস্ত মুসলমানরা সে উজ্জ্বল অধ্যায়ে কালি লেপন করেছে। তোমরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াও। তোমরা যদি সেই কলঙ্কের কালিমা মুছতে চাও, আমি বিশ্বাস করি, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নূরানী আলো দান করবেন। পৃথিবী আবার উজ্জ্বল আলোর রৌশনীতে ভরে যাবে।

তোমরা এই আশা নিয়ে লড়াই করবে, তোমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন তোমাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমাদের জন্য দোয়া করে। মরহুম সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গী

বিশ বছর আগের তৈরী করা সুন্দর মিম্বার তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের মেহরাবে রাখতে চেয়েছিলেন, এখন সে দায়িত্ব তোমাদের উপরে অর্পিত।'

তিনি সেই মিম্বরটি সকলকে দেখিয়ে বললেন, 'এই মিম্বারটি জঙ্গী মরহুমের বিধবা স্ত্রী ও তার কন্যা আমার কাছে এসে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা আমাদের এক মেয়ের দেয়া দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেন লজ্জার শিকার না হই।

আমাদের এই মেয়ে জাতির আরো দুইশ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছে। যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানে পানির পিপাসায় মারা যেতে থাকো বা আহত হয়ে সেবা ও চিকিৎসার অভাবে মারা যাও তবে তারা চিকিৎসা ও সেবাযত্ন দিয়ে তোমাদের সাহায্য করতে চায়।

তোমরা জানো, যুদ্ধের ময়দানে মেয়েদের অংশ নেয়ার আমি পক্ষপাতি নই। তবুও এদের আমি ফিরিয়ে দিতে পারিনি। বন্ধুরা, আমি তাদের এ জন্যই ফিরিয়ে দেইনি, যেনো এদের কথা মনে রেখে তোমরা উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উদ্বেল হতে পারো।

এই মেয়েরা আমাদের অন্তরে প্রেরণার যে বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে তা যেন আমাদের চলার পথকে আলোকিত করে দেয়। আর তোমাদের যেন মনে করিয়ে দেয় এমন বহু মেয়েরা বায়তুল মোকাদ্দাসে কাফেরদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এবং আজো তাদের দুর্ভাগ্যের রজনী শেষ হয়নি।

আমি তোমাদের আগেও অনেকবার বলেছি, শহীদদের যে

জাতি ভুলে যায় সে জাতিকে আল্লাহও ভুলে যান। তাদের ভাগ্য সিল মারা হয়ে যায় লৌহ মাহফুজে, আর চির অভিশাপে পড়ে যায় তারা।

এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তোমরা কিয়ামতে অভিশপ্ত জাতি হয়ে উঠবে অথবা সেই জাতির মত উঠবে, যে জাতির জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহকে বলবেন, 'হে আল্লাহ, এই সে জাতি, যাদের কোরবানী ও আত্মত্যাগের সামনে কাফেরদের ঝঞ্ঝা-তুফান প্রতিহত হয়েছিল আর তোমার সত্য দ্বীনের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল।'

সুলতান আইয়ুবী এমন আবেগময় ভাষণ দিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী এবং জরুরী কথাই শুধু তিনি বলতেন। কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাসের ব্যাপারে তিন এত বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন, যা তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল।

যখনই তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের নাম উচ্চারণ করতেন তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো। তিনি আবেগে ও ক্ষোভে এক হাতের তালুতে অন্য হাত দিয়ে ঘুষি মারতেন এবং অধীর হয়ে পায়চারী শুরু করতেন।

তিনি যুদ্ধপূর্ব এই সমাবেশে সেনাপতিদেরকে এত বেশী আবেগময় ও উত্তেজিত করে তোললেন যে, তিনি যখন বের হয়ে গেলেন তখন কেউ আর কোন কথা বলতে পারলো না। সবার চোখে তখন ভাসছিল যুদ্ধের ময়দান আর অস্ত্রের ঝনঝনানি।

একটু পর। সেনাপতিরা প্রত্যেকেই যার যার বাহিনীর কাছে চলে গেল। তারা তাদের সৈন্যদেরও প্রস্তুত হতে বললো। উদ্দীপনাময় ভাষণ দিয়ে তারা তাদের সৈন্যদেরও ঈমানী অস্ত্রে সজ্জিত করে তুলছিল।

সবাই চলে গেলে সুলতান আইয়ুবী নৌবাহিনীর এ্যাডমিরাল আল ফারেসকে কাছে ডেকে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সাগরের কি অবস্থা?'

আল ফারেস তাকে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বললেন, 'জাহাজগুলো ঠিক মতই টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। আলেকজান্দ্রিয়া থেকেও সংবাদ পাচ্ছি নিয়মিত। খৃস্টানদের কোন নৌবহর সাগরে নেই, শুধু টায়েরের সমুদ্র বন্দরে তাদের কিছু যুদ্ধ জাহাজ আছে।

আমার গোয়েন্দারা জেলেদের ছদ্মবেশে সেখানে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। টায়ের ও তার আশেপাশে খৃষ্টানদের নৌবহরের অস্বাভাবিক কোন সমাবেশ ঘটেনি।

তবে তাদের যে সব জাহাজ ওখানে আছে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অবস্থায়ই আছে। খৃস্টান নৌবাহিনীর সদস্যরা বারুদ নিয়ে কামানের পাশে বসে আছে। এসব কামানের আগুন নাকি অনেক দূর পর্যন্ত আঘাত হানতে পারে।'

'ওদের কামানের নল অনেক লম্বা। তবে তোমাদের সলতেওয়ালা তীর যত দূর যায় এ নলের আগুন তারচে বেশী দূরে যাওয়ার কথা নয়।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'ওদের লম্বা নলের কামান দেখে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।'

'আমাদের কারো মধ্যে এ নিয়ে কোন ভয় ভীতি নেই।' আল

ফারেস বললেন, 'নৌবাহিনীর কমান্ডো দল প্রস্তুত হয়ে আছে। যুদ্ধের সময় ছোট ছোট নৌকায় করে বা ডুব সাঁতারে ওরা শত্রুর জাহাজের নিকট গিয়ে জাহাজ ফুটো করে দেবে অথবা জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

'যুদ্ধ যেন রাতে শুরু হয়।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'দিনের বেলায় কোন কমান্ডো সৈন্য সাগরে নামাবে না। এতে অহেতুক জীবন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খুব সাবধানে থাকবে।'

সুলতান বললেন, 'তোমরা যেমন জেলের ছদ্মবেশে টায়েরে গোয়েন্দা পাঠাচ্ছো ঠিক তেমনি শত্রুর গোয়েন্দাও তোমাদের জাহাজের কাছে আসবে। আগত ফেরিওয়ালাদের দিকে নজর রাখবে। তোমাদের জাহাজগুলো এমন দূরত্বে রাখবে, যেন অতর্কিত আক্রমণে তোমরা দুশমনের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে না যাও। তোমরা এমনভাবে তোমাদের জাহাজগুলোকে সাজিয়ে রাখবে যেন শত্রুর জাহাজ এলে তোমরাই তাদের ঘেরাও করে ফেলতে পারো। দিনের বেলা পতাকা উড়িয়ে ও রাতে আলো জ্বেলে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবে।'

যখন আল ফারেস সুলতান আইয়ুবীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন, তখন ভোর হয়ে গেছে। তিনি ফজরের নামাজের জন্য সেখানেই এক জামাতে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'আল ফারেস!' সালাম ফিরাতেই তিনি শুনতে পেলেন কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে তিনি দেখতে পেলেন, পাশেই গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হাসান বিন আবদুল্লাহ

দাঁড়িয়ে।

আল ফারেস উঠে তার সাথে করমর্দন করলেন। হাসান বিন আবদুল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তা কেমন আছো আল ফারেস? শুনলাম একই সাথে দুই মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছো? দু'জনকেই কি সঙ্গে রেখেছো?'

'ও, হো, ভাই হাসান।' আল ফারেস আনন্দিত স্বরে বললেন, 'আরে না, ওরা তো আমার আশ্রিতা।'

'আশ্রিতা! তুমি আবার দানবীর হলে কবে? কোথায় পেলে মেয়েদের?'

'তারা দু'জন সাগর তীরে দাঁড়িয়ে ছিল। বললো, বেদুইনের মেয়ে। তাদের পুরো বংশ যুদ্ধের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'সবাই মরে গেল আর এই দুই মেয়ে নিরাপদে অক্ষত অবস্থায় বেঁচে রইলো শুধু তোমার কাছে ধরা দেবে বলে?' হাসান বিন আবদুল্লাহর কণ্ঠে শ্লেষ।

তিনি বললেন, 'খৃস্টান বাহিনী বেদুইনের সমস্ত লোককে অশ্ব পদতলে পিষে মেরে ফেলতে পারলো আর এই দুই সুন্দরী মেয়েকে জীবিত ছেড়ে দিল? আসলে তুমি সাগরে থাকতে থাকতে ডাঙ্গার অনেক কিছুই ভুলে গেছো। তুমি কি নিজেকে মারতে চাও নাকি?'

আল ফারেস হাসলেন। বললেন, 'ভাই হাসান, তুমি গোয়েন্দাগিরী করতে করতে শেষে কাক চিলকেও গোয়েন্দা মনে করতে শুরু করেছো। তুমি কি বলতে চাচ্ছো, ওই মেয়ে

দুটিও শত্রুদের গোয়েন্দা?'

'হতে পারে।' হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'তুমি একটু বেশী রকমের সরল মানুষ আল ফারেস। এই মেয়ে দুটিকে টায়েরের উপকূলে নামিয়ে দিয়ে আসো। অজানা মেয়েদের যুদ্ধ জাহাজে রাখা মোটেই উচিত নয়।'

'আমি যদি তাদের মিশরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করি তবে তাতে কি কোন সওয়াব হবে না?' আলফারেস বললেন, 'যদি এদের একজনকে আমি বিয়ে করি ও অন্যজনকে কোন ভাল লোকের সাথে বিয়ে দিয়ে দেই? মেয়ে দুটি বড় অসহায়। তাদের যদি আবার উপকূলে ছেড়ে দেই তবে জানো খৃস্টানরা তাদের নিয়ে কি খেলা খেলবে?'

'যদি মেয়ে দুটি খৃস্টান হয়?' হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'শোন আল ফারেস! তুমি শিশু নও। সাধারণ কোন সৈন্যও নও। তুমি নৌবাহিনীর এক যোগ্য কমান্ডার। একটু বুঝতে ও চিন্তা করতে চেষ্টা করো। আমি শুনেছি, তুমি অবসর সময় ওদের সাথে হাসি তামাশা ও খেলা করে কাটিয়ে দাও। শরিয়ত তোমাকে এমন অধিকার কবে থেকে দিল? তুমি হাজার বার কসম করলেও আমি বিশ্বাস করবো না, মেয়ে দুটি পবিত্র।

যদি তারা তোমাকে ধোঁকা না দিতে পারে তবে তুমি নিজেই ধোঁকায় পড়ে যাবে। সুন্দরী ও যুবতী মেয়েরা মানুষকে সহজেই ফরজ দায়িত্ব থেকে বিপথগামী করতে পারে। যাই হোক আল ফারেস, এখনও সময় আছে, মেয়ে দুটিকে তুমি জলদি জাহাজ থেকে সরানোর ব্যবস্থা করো।'

'যদি আমি তোমার কথা না মানি, তবে?'
'তবে আমাকে দেখতে হবে মেয়ে দুটি কেমন?' হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'যদি সন্দেহ হয় তবে তাদেরকে তোমার জাহাজ থেকে নামিয়ে এনে পরীক্ষা করবো।
কিন্তু সে দায়িত্বটা আমি পালন করতে চাই না। এটুকু দায়িত্ব আমি তোমার উপরই ছেড়ে দিতে চাই। কারণ তুমি আমার পুরাতন বন্ধু। তুমি নিজে চেষ্টা করে দেখো এ থেকে বাঁচতে পারো কিনা? নইলে আমাকে বন্ধুত্ব কোরবানী করে ওদের ধরে আনতে হবে।'
'তুমি আমার পুরনো বন্ধু। এতদিনেও কি আমাকে চিনতে পারলে না? আমাকে নিয়ে কোন বাজে চিন্তা তুমি কি করে করতে পারো হাসান?'
আল ফারেস বললেন, 'তুমি বন্ধুত্বের কথা বলেছো, আমি তো দায়িত্বের কথা বলছি। দ্বীনের পথে দায়িত্ব পালনে আমি আমার জীবনটাই কোরবানী করে দেবো। দুটি অসহায় মেয়েকে আমি আশ্রয় দিয়েছি ঠিক, কিন্তু তুমি বিশ্বাস না করলেও বলবো, ওদের আমি অপবিত্র করিনি। আর দেখে নিও, এ মেয়েরা আমার দায়িত্ব পালনে কোন বাঁধা সৃষ্টি করতে পারবে না।
এমনকি তারা আমার কোন ক্ষতি সাধনও করতে পারবে না। তাদের প্রতি আমার সামান্য সন্দেহ হলেও আমি তাদেরকে সাগর উপকূলে নামিয়ে দিয়ে আসবো নইলে জীবন্ত সাগরে ফেলে দেবো।'
'তুমি কখন ফিরে যাচ্ছো?' হাসান বিন আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস

করলেন :

'ভাবছি, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবো। সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। সামান্য ঘুমিয়ে নিয়েই নাস্তা সেরে রওনা হয়ে যাবো।' আল ফারেস বললেন, 'সন্ধ্যা পর্যন্ত নৌকা আমার জন্য উপকূলে অপেক্ষা করবে। তার আগেই আমি জাহাজে পৌঁছে যাবো।'

আল ফারেসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসান বিন আবদুল্লাহ তার নিজের কামরার দিকে চলে গেলেন। ওখানে পৌঁছেই তিনি তার এক কমান্ডারকে ডেকে পাঠালেন।

কমান্ডার এলে তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন, 'আল ফারেসের নৌবাহিনীর জাহাজ অমুক স্থানে নোঙ্গর করা আছে। কোন একটি ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে তুমি সেখানে যাবে। আল ফারেসের সহকারী ক্যাপ্টেন রউফ কুর্দীকে বলবে, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।'

রউফ কুর্দীকে হাসান একটি চিঠি দিলেন। তাতে তিনি লিখলেন, 'এই লোককে জাহাজের কোন ডিউটিতে লাগিয়ে দেবে। আমি জানতে পেরেছি, জাহাজে দুটি মেয়ে আছে। ওই মেয়েদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তার জাহাজে থাকা প্রয়োজন। আমি জানতে চাই, তাদের অনুসরণ করে জাহাজের পিছনে কোন গোপন ছায়া অনুসরণ করছে কিনা? যদি তেমন দেখা যায় তবে একে দিয়ে মেয়েদেরকে গোয়েন্দা হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেবে।'

হাসান বিন আবদুল্লাহ কমান্ডারকে বললেন, 'দেরী না করে এখনই রওনা হও। কোন পালতোলা ডিঙি নৌকা নিয়ে চলে

যাও জাহাজে। মেয়েদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখবে ওরা খৃস্টান গোয়েন্দা কিনা? কোন রকম সন্দেহ হলে ওদের নিয়ে চলে আসবে হেডকোয়ার্টারে।'

বাতাস বেশ জোরে বইছিল। বাতাসের গতিও ছিল অনুকূল। দুপুরের আগেই নৌকা জাহাজের কাছে পৌঁছে গেল। রউফ কুর্দীর নাম বলতেই রশির সিঁড়ি ফেলে তাকে জাহাজে তুলে নিল খালাসীরা।

লোকটি উপরে উঠেই রউফ কুর্দীর সাথে সাক্ষাত করলো। হাসান বিন আবদুল্লাহর দেয়া চিঠি তুলে দিল তার হাতে। নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য খুলে বললো মুখে।

রউফ কুর্দী যখন জানলো সে একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা, ব্যাপারটা তার মোটেই ভাল লাগলো না। সে এই ভাব গোপন করতে পারলো না, বরং গোয়েন্দা কমান্ডার তার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝলো হাসান বিন আবদুল্লাহর গোয়েন্দা পাঠানোর ব্যাপারটি সে পছন্দ করেনি।

কিন্তু এ লোকের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার সাহস ছিল না রউফ কুর্দীর। কারণ সে ভাল করেই জানে, একজন গোয়েন্দা সুলতান আইয়ুবী কাছে যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ততখানি গুরুত্ব কোন সেনাপতিরও নেই। বরং গোয়েন্দার একটি সামান্য রিপোর্ট কোন সেনাপতির মৃত্যুর কারণ হয়ে যেতে পারে। তাই সে মনের ভাব গোপন করে গোয়েন্দার খাতির যত্নে মন দিতে বাধ্য হলো।

'আপনি কি মেয়ে দুটিকে প্রথম দিন থেকে লক্ষ্য করে আসছেন?'

গোয়েন্দা কমান্ডার রউফকে জিজ্ঞেস করলো, 'তাদের সম্পর্কে যদি আপনার সামান্যও সন্দেহ হয় তবে বলুন, আমি ওদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আসকালান নিয়ে যাবো।'

'আমি ওদের কার্যকলাপে সন্দেহ করার মত কোন কিছু দেখতে পাইনি।' রউফ কুর্দী উত্তর দিল, 'মেয়ে দুটি অধিকাংশ সময় আল ফারেসের কামরাতেই থাকে।'

রউফ কুর্দীর হঠাৎ ফ্লোরীর কথা স্মরণ হলো। যদি এই গোয়েন্দা একদিন আগেও আসতো তবে রউফ কুর্দী তাকে বলতো, 'এ মেয়েদেরকে এখুনি এখান থেকে নিয়ে যান। ছয়টি জাহাজের এই বহরের কমান্ডার এ্যাডমিরাল আল ফারেস এদের নিয়ে মউজে মেতে আছে। এ্যাডমিরালকে তারা যে কোন মুহূর্তে বিভ্রান্ত করে ফেলতে পারে।'

কিন্তু গত রাতেই ফ্লোরী তাকে বলেছে, সে মনেপ্রাণে রউফ কুর্দীকে ভালবাসে। আল ফারেসের ভালবাসার জালে বন্দী হয়েছে রোজী, এ জন্য আল ফারেসকে সে ভালবাসা দিতে পারে না। তাই সে বাধ্য হয়েছে বিকল্প ভালবাসার জন খুঁজে নিতে। আর তা খুঁজতে গিয়েই সে রউফ কুর্দীকে ভালবেসে ফেলেছে।

এ কথা জানার পর রউফ কুর্দী কি করে ফ্লোরীর কাছ থেকে দূরে থাকার কথা ভাবতে পারে? তাই সে এখন কোনভাবেই তাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দেয়ার কথা ভাবতে পারে না।

ফ্লোরীর গত রাতের আচরণ ও কথায় তার অন্তরে আল ফারেসের প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ গোয়েন্দা না এলে আল ফারেসের কাছ থেকে মেয়েদের কি করে সরানো যায় সে এই চিন্তা করতো। কিন্তু এখন আর সে মেয়েদের এখান থেকে সরাতে চায় না। কারণ তাহলে যে সে নিজেই ফ্লোরীকে হারাবে।

'এখনতো আমাকে আপনার কাছেই থাকতে হবে।' গোয়েন্দা বললো, 'আল ফারেস যেন জানতে না পারে আমি এখানে গোয়েন্দাগিরী করতে এসেছি। আপনি তো চিঠি পড়ে সবই বুঝেছেন। মেয়েদের নিয়ে আপনার আর চিন্তা করতে হবে না। আমি নিজেই যাচাই করে দেখবো, ওরা কেমন মেয়ে, কি তাদের মতিগতি।'

'ওদের ব্যাপারে অবশ্য সবচে ভাল বলতে পারবেন আল ফারেস। কারণ মেয়েরা সারাক্ষণ তার কাছেই থাকে। তবে ওদের আচরণ সন্দেহজনক হলে তিনি নিশ্চয়ই তাদের এতটা প্রশ্রয় দিতেন না।'

'ঠিক আছে, ওটা আমি দেখবো। মেয়েদের কোন গোপন তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হবে না যদি আমি জানতে পারি, আল ফারেস এদের ফাঁদে পড়ে তার দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য দেখাচ্ছে আর অধিকাংশ সময় মেয়েদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এমনটি দেখলে আমি মেয়েদের কিছুতেই এখানে থাকতে দেবো না।'

গোয়েন্দা কমান্ডার তাকে আরো বললো, 'আলফারেস জানে না, আমি এখানে গোয়েন্দাগিরী করছি। এটা তার জানার কথাও

নয়। কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না আমি এখানে কোন উদ্দেশ্যে এসেছি। আমি আপনাকে আবারও বলছি, আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল ফারেসকে আপনি কিছুই বলবেন না।'

এটা যুদ্ধ জাহাজ হলেও এখানে কেবল নৌবাহিনীর অফিসার ও সৈন্যরা আছে এমন নয়। জাহাজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং রান্নাবান্না ও খাবার পরিবেশন করার লোকজনও এ জাহাজে আছে। এছাড়াও আছে আরো কিছু কাজের লোক। এখানে নিজের আসল পরিচয় গোপন রেখে দু'একজন লোক থাকা অসম্ভব ছিল না।

আল ফারেস এই বহরের কমান্ডার থাকায় তারচে নিম্ন পদে চাকরী করে এমন কারো সাধ্য নেই তার কাজে নজরদারী করে। চাকর বাকর ও সৈন্যদের কারো পক্ষে তার কাজকে ভিন্ন চোখে দেখার ও বলার কোন সুযোগ ছিল না।

তারা জাহাজে অচেনা এক লোককে দেখতে পেলো ঠিকই কিন্তু এ লোক কোত্থেকে কেন এলো তা কেউ জিজ্ঞেস করতে এলো না। একমাত্র রউফ কুর্দী জানতো এ লোক কে? কিন্তু সে মোটেই পছন্দ করতে পারছিল না স্বাধীনভাবে জাহাজের সর্বত্র এই গোয়েন্দা কমান্ডারের ঘুরাফেরা ও নজরদারী।

হাসান বিন আবদুল্লাহর পাঠানো গোয়েন্দা প্রথম দিন মেয়ে দুটিকে দেখেই রউফ কুর্দীকে বললো, 'এরা মোটেই বেদুইন মেয়ে নয় বা কোন বাস্তুহারা বিপন্ন মেয়েও নয়। এদের দেখেই আমার গভীর সন্দেহ হচ্ছে।'

'এতদিন ধরে এরা আমাদের সাথে আছে। কই, এদের কাউকে তো কোন সন্দেহজনক কাজ করতে দেখলাম না!'

রউফ কুর্দী বললো, 'ওদের ব্যাপারে আমার মনে এখনো কোন সন্দেহ নেই।'

'আমি যে সব বিষয় লক্ষ্য করি সে সব বিষয়ে আপনাদের কোন ধারণাই নেই।' গোয়েন্দা বললো, 'শীত প্রধান দেশের যাযাবর মেয়েদের রং এমন হয় কিন্তু তাদের চোখের রং এমন হয় না। তাদের মধ্যে এমন শহুরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভাবও দেখা যায় না।

দেখুন, আমরা এখন ভয়ংকর যুদ্ধে জড়িয়ে আছি। এ অবস্থায় আমাদের যুদ্ধ জাহাজে কোন অপরিচিত মেয়ে রাখা সম্ভব নয়। আমি এ মেয়েদের এখানে থাকতে দিতে পারি না।'

'আরও কয় দিন দেখো।' রউফ কুর্দী বললো, 'এমনও তো হতে পারে, মেয়ে দুটি আসলেই বিপদগ্রস্ত কিন্তু তুমি ওদের এখান থেকে সরিয়ে আবার বিপদের মাঝে ফেলে দিচ্ছো?'

'আচ্ছা! আপনি যখন বলছেন আর কিছুদিন না হয় দেখি।'

'তাই করো। তাড়াহুড়ো না করে ভালো মত বুঝে নিয়েই সিদ্ধান্তে আসা উচিত।'

সুলতান আইয়ুবী তাঁর সেনাপতিদের ঠিক কথাই বলেছিলেন। বায়তুল মোকাদ্দাসে যে খৃষ্টান জেনারেলরা আছে তারা ভাল করেই জানতো, মুসলিম বাহিনী বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এদিকে যখন সুলতান আইয়ুবী তার সেনাপতিদের শেষ নির্দেশ দান করেছিলেন সে সময় বায়তুল মোকাদ্দাসে ক্রুসেড বাহিনীর হাইকমান্ড তার জেনারেলদের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

'আমরা সালাহউদ্দিনকে রাস্তায় বাঁধা দেবো না।' তাদের হাইকমান্ড বলছিলেন, 'নিঃসন্দেহে তাঁর সৈন্য সংখ্যা আমাদের তুলনায় অনেক কম, কিন্তু তাদের খাদ্য ও অস্ত্রের কোন ঘাটতি নেই। তাদের সাপ্লাই ব্যবস্থা দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য।

তাদেরকে বায়তুল মোকাদ্দাস অবরোধ করতে দাও। আমাদের কাছে দীর্ঘদিনের খাদ্য মজুদ আছে। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামও আছে যথেষ্ট পরিমাণে।

যদি তাদের অবরোধ দীর্ঘ হয় ও আমাদের রসদ কমে যায় তাতেও ভীত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের নাইট বাহিনী তাদের রসদ পাওয়ার পথও বাঁধাগ্রস্ত করে ফেলবে। তখন মুসলমানরা ক্ষুধা ও পিপাসায় মরতে থাকবে। আর আমরা কম আহার করে খাদ্যের মজুদ দীর্ঘদিন ধরে রাখবো।

এই যুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বাহিনী হচ্ছে নাইটদের বাহিনী। তাদের এক অংশ ইতিমধ্যেই বাইরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছে। আরেক অংশ শহরে থাকলেও তারা কমান্ডো স্টাইলে যুদ্ধ করবে।'

তিনি উপস্থিত কমান্ডারদের সাহস ও প্রেরণা সৃষ্টির জন্য বললেন, 'তারা আইয়ুবীর নিয়মিত বাহিনীর ওপর অতর্কিত আঘাত করে আবার ফিরে আসবে। আমি আপনাদের সকলকে

বলতে চাই, অতীতের সকল অবরোধের মতই মুসলমানদের এ অবরোধও বিফল হবে।'

'আপনি সৈন্যদের অবস্থা সামনে রেখে কথা বলছেন না।' এক জেনারেল বললো, 'শহরের বাইরে যে রণক্ষেত্রটি হাতিন থেকে আসকালান পর্যন্ত বিস্তৃত, এখন সেখানে আমাদের যুদ্ধ করার শক্তি শিথিল হয়ে গেছে। বরং বলা ভুল হবে না যে, আমাদের সৈন্যদের উপর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বাহিনীর বিভীষিকা বিরাজ করছে। শহরে স্থায়ী সৈন্যরা আগে কখনও ময়দানে যুদ্ধ করেনি। প্রতিরক্ষার ট্রেনিং থাকলেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওদের নিয়ে ময়দানে যাওয়া যাবে না। অতীতের অভিজ্ঞতার কারণে মুসলমানরা এবার তাদের সরবরাহ লাইন অটুট রেখেই সামনে এগুচ্ছে। সে জন্যই পথের প্রতিটি ফাঁড়ি তারা দখল করে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে সামনে পা বাড়াচ্ছে। আপনি এসব বিষয় বিবেচনায় আনছেন না।'

'আমরা সে সমস্যার সমাধানও খুঁজে পেয়েছি।' কমান্ডার-ইন-চীফ বললেন, 'আমাদের সম্মানিত পাদ্রী সৈন্যদের মাঝে ঘোরাফেরা করছেন। তিনি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের দায়িত্ব সচেতন করার চেষ্টা করছেন।

তিনি তাদের বুঝাচ্ছেন, মুসলিম বাহিনীকে কেন পরাস্ত করা প্রয়োজন। তিনি সবার সামনে এটা যে ধর্মযুদ্ধ তা বলিষ্ঠতার সাথে তুলে ধরছেন। যদি জেনারেলরা ধর্মীয় আবেগ নিয়ে যুদ্ধ করে তবে সৈন্যরাও ধর্মীয় উদ্দীপনা ও আবেগ নিয়েই যুদ্ধ করবে।'

তিনি জেনারেলদের আবেগ আরো উস্কে দেয়ার জন্য বললেন, 'যদি আমরা বায়তুল মোকাদ্দাস রক্ষার এ যুদ্ধে হেরে যাই তবে মনে রেখো, ভূমধ্যসাগরও আমাদের আশ্রয় দেবে না।'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কেন এত বিজয় লাভ করছে? তার সৈন্য বল, অস্ত্র বল সবই আমাদের চেয়ে কম। তাহলে এই শক্তি সে পাচ্ছে কোথায়?' প্রশ্ন কর এক সেনাপতি।

'তাদের মূল শক্তি হচ্ছে তাদের ঈমান।' কমান্ডার-ইন-চীফ বললেন, 'তারা একনিষ্ঠ ধার্মিক। মুসলমানরা বিশ্বাস করে ধর্মযুদ্ধে মারা গেলে তারা শহীদ হয়। আর শহীদরা সবাই স্বর্গে যাবে। স্বর্গে যাওয়ার আশায় মৃত্যুভয়কে তারা সহজেই জয় করে নেয়।

তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য হচ্ছে, আমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলকে পাদ্রীদের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই কোরআন পড়েই তাদের মধ্যে শহীদ হওয়ার দুর্বার আকাঙ্খা তৈরী হয়ে যায়।'

'তাহলে এই কোরআনকে তাদের হাত থেকে সরিয়ে সেই হাতে আমরা অন্য কিছু তুলে দেয়ার চেষ্টা করছি না কেন?' বললো এক কমান্ডার।

'কে বললো করছি না? আমরা তো অনেক কাল ধরেই সে চেষ্টা করে আসছি। আর আমাদের চেষ্টা একেবারে ব্যর্থও হয়নি।

আমরা কোরআনকে ওদের হাত থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য তাকে অতি মূল্যবান বস্তু বলে বুঝাবার চেষ্টা করছি। যারা

তাদের মধ্যে বেশী ধর্মভীরু তারা এই পবিত্র জিনিস রেশমী গেলাফে মুড়িয়ে ভক্তিভরে তাকে তুলে রাখে।

আর যারা এখনো ধর্মের ব্যাপারে তেতোটা সচেতন নয় তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করছি, এই পবিত্রগ্রন্থ পাপী হাতে ধরা ঠিক নয়। তাতে তোমাদের পাপ আরো বাড়বে।'

আমরা তাদের আরো বলেছি, 'জীবনে উন্নতি করতে হলে ধর্ম আর জীবনকে আলাদা করে নাও। তাহলে তোমরা নির্বিচারে আয়-রোজগার করতে পারবে এবং জীবনকে উপভোগ করতে পারবে।'

এভাবে আমরা তাদের বিভ্রান্ত করেই তো দীর্ঘকাল পারস্পরিক যুদ্ধেবিগ্রহে লিপ্ত করে দিয়েছিলাম ওদের। তারা গৃহযুদ্ধ করে যে পরিমাণ ধ্বংস হয়েছে লড়াই করে ততোটা ক্ষতি আমরা কোনদিনই করতে পারতাম না।

কোরআন থেকে দূরে সরাতে পেরেছিলাম বলেই তো আমরা ওদের মনে লোভ জাগাতে পেরেছিলাম। ক্ষমতার লোভ, সম্পদের লোভ। কোরআন থেকে দূরে সরাতে পেরেছিলাম বলেই তো আমরা মুসলমানদের মধ্য থেকে এত অধিক সংখ্যক গাদ্দার জোগাড় করতে পেরেছিলাম।

কিন্তু আইয়ুবী ও তার বাহিনীকে আমরা কোরআন থেকে সরাতে পারিনি। পারিনি বলেই তাদের ঈমানী চেতনা নষ্ট হয়নি। সুলতান আইয়ুবী খুবই হুশিয়ার এক সমরবিদ। তিনি গৃহযুদ্ধরত মুসলমানদের কৌশলে আবার এক করে নিয়েছেন। তার সফলতার পেছনে তার সমরকৌশলই কাজ করেছে।'

'আমাদের ব্যর্থতার কারণগুলো খুঁজে বের করা দরকার।' বললেন এক জেনারেল। তিনি বললেন, 'আমরা যে শাসকদের তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিলাম এখন তারা ফিরে দাঁড়িয়েছে। তারা আইয়ুবীর অনুগত হয়ে যাওয়ার ফলে তাদেরকে আমরা যে অস্ত্র দিয়েছিলাম সে অস্ত্র এখন আইয়ুবীর বাহিনীর হাতে চলে গেছে। আইয়ুবী এখন আমাদের অস্ত্র দিয়েই আমাদের মারছে।

আমরা যেসব সুন্দরী মেয়েদের পাঠিয়ে ছিলাম তাদেরকে দুর্বল ও কাবু করার জন্য, বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের সে মেয়েরা ব্যর্থ হয়েছে। এতদিন আমরা একটি ভুল ধারনার মধ্যে ছিলাম। আমাদের আশা ছিল, মেয়েদের দিয়েই আমরা বিরাট রকম সফলতা আদায় করতে পারবো। কিন্তু আমাদের সে আশা সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ব্যর্থ করে দিয়েছে।'

'আমাদের কোন ত্যাগ বৃথা যায়নি।' মহান বেত্রিক যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বললেন, 'আপনার এ চিন্তা সম্পূর্ণ ভুল যে, ধর্ম যুদ্ধ শুধু সৈন্যরাই করে থাকে। আমাদের ধর্মের উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং শত্রু ধর্মের অধঃপতন ও দুর্গতি যদিও অস্ত্রের সাহায্যে হয়েছে, কিন্তু তাদের মগজ ধোলাই ও ভুল পথে পরিচালনার কৃতিত্ব আমাদের বুদ্ধিজীবিদের।

তারা মুসলমানের আত্মাকে কলুষিত করার এমন সব পদ্ধতি বের ও প্রয়োগ করেছে, যে প্রক্রিয়ার সাফল্যের কারণেই আইয়ুবী এতদিন সামনে বাড়তে পারেনি। ফলে আপনি বলতে পারেন না, আমাদের ত্যাগ ব্যর্থ হয়েছে।'

অন্য এক সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা আমাদের সেই সব মেয়েদের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা তাদের রূপের জালে আমাদের বড় বড় দুশমন শাসকদের ঘায়েল করে আমাদেরকে অনিবার্য যুদ্ধের হুমকি থেকে রক্ষা করেছিল।

তারা নিজেদের সুখ ও আরাম বিসর্জন দিয়ে ধর্মের জন্য যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেছে, তার জন্য আমি তাদের কুর্নিশ করি। ধর্মের জন্য তারা মুসলমানদের মহলে ও রাজ দরবারে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।

মুসলমানদের মধ্যে তারাই গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করেছিল। মুসলিম শাসকদের ঈমান ক্রয়ের কৃতিত্বও তাদেরই। তারা একই শাসকের অধীন গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিতেও কৃতিত্ব দেখিয়েছে। অতএব তাদের ব্যাপারে আমাদের সমীহ করে কথা বলা উচিত।'

কমান্ডার-ইন-চীফ তার কথার সূত্র ধরে বললেন, 'ক্রুসেড বাহিনীর জেনারেলগণ! আমার বন্ধু ঠিকই বলেছে, শত্রুকে কাবু করার উত্তম পথ হলো, তাদের নেতাদের মধ্যে বিলাসিতা ও যৌন উন্মাদনা সৃষ্টি করে দেয়া। তাদের মধ্যে নাচ গানের মত অলস বিলাসিতা জাগিয়ে দাও। তাদের শাসক গোষ্ঠীর অন্তরে ক্ষমতা, সিংহাসন এবং ঐশ্বর্যের লালসা সৃষ্টি করে দাও।

মনে রেখো, মুসলিম জাতি ততোদিন বিশ্বনন্দিত থাকবে যতোদিন তাদের বীর সিপাহীরা ধর্মীয় উন্মাদনা নিয়ে লড়াইয়ে নামবে। তাদের মধ্যে ধর্মের চেতনা চির জাগ্রত ও অক্ষয়

থাকলে শুধুমাত্র সংখ্যার জোরে আমরা ওদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবো না।

তাদের মতো আমরা যেমন কমান্ডো বাহিনী গঠন করেছি তেমনি তাদের মতো ধর্মীয় চেতনাও আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাদের সম্মানিত পাদ্রীরা সে চেষ্টা করছেন। আমাদের নাইটরা তাদের কাছে দীক্ষা নিচ্ছেন। বিজয়ের জন্য এই মূলমন্ত্রেই সমগ্র খৃস্টান জাতি এবং বিশেষ করে সৈন্যদের আজ জাগিয়ে তুলতে হবে।

তোমরা জানো, ইসলাম আজ ইউরোপেও প্রবেশ করেছে। ভারত এবং চীনেও ইসলাম প্রসারিত হয়েছে। চীনের নৌবাহিনী প্রধান একজন মুসলমান। সেখানকার বিভিন্ন জেনারেলরাও মুসলমান। ভারত মহাসাগরের পুর্ব দিকে যাও, সেখানে দেখতে পাবে বড় বড় দ্বীপের শাসক গোষ্ঠী আরবীয় মুসলমান। তোমরা ইসলামের এই গতি শুধু অস্ত্র দিয়ে রুখতে পারবে না। এর গতিকে রুখতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

'কি হবে আমাদের সে কৌশল?' প্রশ্ন করলো এক কমান্ডার।

'সবার আগে বায়তুল মোকাদ্দাসের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে অটুট রাখতে হবে। এরপর আইয়ুবী ফিরে গেলে আমাদের প্রথম কাজ হবে তাদের পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদীনা আক্রমণ করা।'

সেই সাথে আবার নতুন করে উদ্যোগ নিতে হবে মুসলমান আমীর ও সুলতানদেরকে যে কোন মূল্যে আমাদের দিকে

ফিরিয়ে আনা। এ জন্য তাদেরকে পর্যাপ্ত সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দান করতে হবে।

এই সুযোগে আবার তাদের অন্দর মহলে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুন্দরী মেয়েদের প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। মুসলমানদের নফসকে জাগ্রত করতে না পারলে তাদের ধর্মীয় আবেগ কখনোই দমানো সম্ভব হবে না। এ কাজ আমরা আগেও করেছি, আবার নব উদ্যমে তা শুরু করতে হবে।

আমি ইহুদীদের কুর্নিশ করি, কারণ আমরা এ নিয়ম ইহুদীদের কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করেছি। তারা মুসলমানদের বিপথগামী করার নানা পথ আবিষ্কার করেছে।

যৌনতা বিস্তারের কর্মসূচী যেখানে কাজ করবে না সেখানে ধর্মীয় কুসংস্কার ঢোকানোর পথ ব্যবহার করতে হবে। এসব কাজে ইহুদীরা খুবই পারদর্শী। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে, মুসলমানদের ঈমানী চেতনা বিনষ্টের জন্য তারা চিরকাল কাজ করবে। এসব বিষয়ে তারা সুক্ষ্ম কর্মতৎপরতা চালাবে, যা আমাদের চিরকাল সাহায্য করবে।

আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, সেই সময় আমাদের সামনে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে, যখন বায়তুল মোকাদ্দাস আমাদের চিরস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারে এসে যাবে। আর বায়তুল মোকাদ্দাস আমাদের অধিকারে থাকলে আশপাশের অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের জন্য তেমন কঠিন হবে না।

জেরুজালেম ও তার আশপাশের অঞ্চলকে মুসলমান মুক্ত করা প্রয়োজন ছিল আমাদের। বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের হত্যা করলে

বিশ্ববাসী আমাদের খারাপ ভাবতে পারতো।

সুলতান আইয়ুবীর এ আক্রমণের ফলে আমাদের জন্য মুসলমানদের হত্যা করার একটা অজুহাত সৃষ্টি হয়ে গেলো। এ সুযোগ আমরা কাজে লাগাবো এবং জেরুজালেম ও তার আশপাশের সমস্ত অঞ্চলের মুসলমানদের কচুকাটা করে প্রতিশোধ নেবো আইয়ুবীর এ ঔদ্ধত্যের।

ইহুদী বুদ্ধিজীবিরা আমাদের পরামর্শ দিয়েছে, মুসলমান রাজ্যগুলোকে খন্ড খন্ড করে ওদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দাও। যদি শত্রু বানাতে না পারো তবে অন্তত ওদের ঐক্য নষ্ট করে দাও। এ জন্য তাদের মধ্যে সৃষ্টি করো আঞ্চলিক জাতীয়তাবোধ।

ইসলামী জাতীয়তার বদলে ওদের মধ্যে সৃষ্টি করো ভৌগলিক জাতীয়তাবোধ। তারা মুসলমান নয়, নিজেদের পরিচয় দেবে আরবী, মিশরী, কুর্দী, ইরাকী বলে। তারপর এই জাতীয় পরিচয়কে বলিষ্ঠ করার জন্য তাদের সাহায্য করো অর্থ এবং অস্ত্র দিয়ে।

যখন দেখবে তাদের মধ্য থেকে কেউ মাথাচাড়া দিয়ে উঠার মতো শক্তিশালী হয়ে গেছে তখন এতদিনের দেয়া সাহায্য সুদে-আসলে আদায় করা শুরু করবে। দেখবে উঁচু মাথা দু'দিনেই নিচু হয়ে গেছে।

আমি মনে করি, ইহুদী বিশেষজ্ঞরা ঠিকই বলেছেন। মুসলমান জাতির প্রত্যেকেই নিজেকে শাসক মনে করে। কিন্তু তারা জানে না, তাদের প্রভুত্ব আমাদের হাতে।

আমরা হয়তো আমাদের কাজে সামান্য ঢিলেমি করেছিলাম, এই সুযোগে ধুরন্ধর আইয়ুবী তার স্বজাতির ভাইদেরকে তার দলে টেনে নিয়ে আমাদের ওপর আঘাত হানতে এসেছে। কিন্তু বার বার তাকে আমরা এমন সুযোগ দিতে পারি না।

আমাদের এই কর্মসূচী সফল করার জন্য আমাদের এমন সুক্ষ্ম পথ অবলম্বন করতে হবে যাতে ওরা আমাদের ষড়যন্ত্র ধরতে না পারে। এ কাজে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করবে আমাদের ধর্মীয় নেতারা।

তারা প্রেম ও মানবতার বাণী নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। অহিংসার পথে তারা মানুষকে ডাকবে। ওদের অনুসরণ করে অর্থনৈতিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাবে আমাদের পরবর্তী বাহিনী। লোকজন যখন আমাদের পাদ্রী ও সাহায্যদাতাদের ওপর খুশী হয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে ঢেকুর তুলতে যাবে তখন যাবো আমরা।

আমরা সৈন্য বা সামরিক বিভাগের লোক। আমরা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের কাজ করবো। কিন্তু এসব করতে হলে সবার আগে যা করতে হবে তা হচ্ছে, আইয়ুবীকে নাস্তানাবুদ করে ফেরত পাঠানো বা তাকে নিঃশেষ করে দেয়া। আসুন আমরা আমাদের সবচে বড় শত্রু, যে শত্রু এখন আমাদের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে এগিয়ে আসছে, তাকে প্রতিহত ও পরাজিত করি।'

সেদিন রোববার। সকাল বেলা। ১১৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখ । সুলতান আইয়ুবী অবিশ্বাস্য গতিতে

বায়তুল মোকাদ্দাসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছলেন।
ক্রুসেড বাহিনী সুলতান আইয়ুবীর আগমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তারা আশা করেনি, তিনি এমন ঝড়ের বেগে এসে পড়বেন। কারণ রাস্তায় ক্রুসেডদের বড় বড় কেল্লা রয়েছে। রয়েছে অনেক ফাঁড়ি। তাকে ওদের সাথে মোকাবেলা করে এগুতে হবে। তারা মনে করছিল, কোন কেল্লা বা ফাঁড়িতে তিনি পৌঁছলে ওরা সামর্থ অনুযায়ী বাঁধা দেবে।
তারা ওর পথরোধ করতে না পারলেও তার গতিকে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আগমনের খবর জেরুজালেম পৌঁছে দেবে। কিন্তু তিনি সে সব উপেক্ষা করে এবং পথের অপেক্ষমান সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে কেমন করে এত দ্রুত জেরুজালেমের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলেন?
সুলতান আইয়ুবী যখন জেরুজালেমের ফটকের সামনে পৌঁছলেন তখন রাত। তিনি তাঁর অভিযানের সংবাদ নিয়ে কাউকে আগে আসতে দেননি। কমান্ডো বাহিনীর মাধ্যমে এ ব্যাপারটি তিনি নিশ্চিত করেছিলেন।
শহরের কাছে এসেই তিনি নিশ্চিত হলেন, তার অভিযানের খবর এখনো জেরুজালেম পৌঁছেনি। কারণ সুলতান আইয়ুবীর প্রথম সৈন্যদলটি শহরের কাছে পৌঁছে দেখতে পেলো, প্রচীরের উপরে দু'চার জন সৈন্য ভয়ভীতিহীন নিশ্চিন্ত মনে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। শহরের দরজা বন্ধ। ভেতরে গির্জার ঘন্টাধ্বনির শব্দ শোনা যাচ্ছে।
সহসা শহর প্রাচীরের বাইরে বিউগল ও কাড়া নাকারা বেজে

উঠলো। খৃস্টান জেনারেলরা চমকে উঠে সৈন্যদের প্রাচীরের ওপর উঠে যাওয়ার হুকুম দিল। চারদিকের প্রাচীরের উপর ছুটে গেল খৃস্টান সৈন্যরা।

একটু পর। আইয়ুবী দেখতে পেলেন ফাঁকা প্রাচীর মুহূর্তে ভরে গেল মানুষের মাথায়। সে মাথাগুলোতে শোভা পাচ্ছে লোহার হেলমেট। তাদের হাতে তীর ধনুক। এসব মাথার সংখ্যা ক্রমেই আরও বাড়তে লাগলো। শেষে এমন দেখা গেল যে, প্রাচীরের উপর মানুষের আরেকটি প্রাচীর দাঁড়িয়ে গেছে।

শহরের পশ্চিম দিকে কিছুটা পাহাড়ী অঞ্চল ছিল। সুলতান আইয়ুবী সেদিকে তার বাহিনীর একটি গ্রুপকে ক্যাম্প করে বসিয়ে দিলেন। তিনি নিজে অশ্বারোহণ করে শহরের আশপাশে তার সৈন্য সমাবেশ দেখতে লাগলেন।

তিনি শহরের চার পাশ দিয়ে ঘুরছিলেন আর দেখছিলেন শহরের প্রাচীর কোন স্থানে দুর্বল। শহরের দেয়াল ফুটো করে সুড়ং পথ নির্মাণের জন্য একটি যুৎসই জায়গা বাছাই করার ওপর নির্ভর করছে দেয়াল ভাঙ্গা বাহিনীর সাফল্য।

সুলতান আইয়ুবী প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য এক আত্মঘাতি দুর্ধর্ষ দল গড়ে তুলেছিলেন, যাদের কৃতিত্বের বহু কাহিনী আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল খৃস্টান সৈন্যদের কাছে। মুসলিম সৈন্যরা শহরের চারদিক অবরোধ করেছিল কিন্তু কোন দিক দিয়েই কোন হামলা করেনি।

মুসলমানদের একটি বড় দল ছিল শহরের পশ্চিমে, তখনো তারা ছিল খৃস্টান সৈন্যদের দৃষ্টির আড়ালে। এদিকে শহরের

প্রাচীর সংলগ্ন দুটি দৃঢ় গম্বুজ আছে। একটা দাউদের গম্বুজ ও অপরটি ট্যাংকার গম্বুজ নামে খ্যাত। এই গম্বুজের মধ্যে দূরে তীর নিক্ষেপকারী কামান ও মেঞ্জানিক পাতা।

সুলতান আইয়ুবী শহরের আশে পাশে দেয়াল নিরীক্ষণ করে ফিরছেন। পশ্চিম দিকের বাহিনী প্রধান আগুন ও ভারী পাথর নিক্ষেপকারী মেঞ্জানিক স্থাপন করতে শুরু করলো।

ক্রুসেড বাহিনী বীরত্ব প্রদর্শন করে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী নাইটদের বেরোবার জন্য শহরের একটি গেট খুলে দিল। সেই গেট দিয়ে লৌহ পোষাকধারী নাইট সেনারা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে হাতে বর্শা নিয়ে দ্রুত বেগে অশ্ব ছুটিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে তারা মুজাহিদ বাহিনীর উপর তীব্র আক্রমণ চালালো। নাইট বাহিনী বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই তাদের গেট বন্ধ হয়ে গেল।

প্রশস্ত ময়দানে ছুটছে নাইটরা। লৌহ পোষাকের জন্য তাদের গায়ে তীর বিদ্ধ হচ্ছে না। তারা এমন তীব্র ও অপ্রত্যাশিত গতিতে এগিয়ে এলো যে, কতক মুজাহিদ নাইটদের বর্শার খোঁচায় আহত ও শহীদ হয়ে গেলো।

কিছু সংখ্যক পিষ্ট হলো নাইটদের অশ্বপদ তলে। তারা যেমন ক্ষিপ্র গতিতে এসেছিল তেমনি ক্ষিপ্র গতিতে ধূলির ঝড় তুলে আবার ফিরে গেল দরজার কাছে।

মুসলিম বাহিনীর সৈন্যরা আহতদের তুলে আনতে ছুটলো। তখন পিছনে কয়েকজন মেয়ের চিৎকার শোনা গেল, 'তোমরা

সরে যাও, এ কাজ আমাদের।'

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো মেয়ে দৌড়ে এলো। তারা কাঠের খাটে করে আহতদের উঠিয়ে নিল। মেয়েরা কাঁধে বয়ে আনা পানির মশক থেকে আহতদের পানি পান করালো।

তখনো ক্রুসেড বাহিনীর নিক্ষিপ্ত তীর ছুটে আসছিল তাদের দিকে। এতে দু'তিনজন মেয়ে পড়ে গেল।

মুসলমান তীরন্দাজরা সেখানে উপস্থিত হয়ে ঢাল দিয়ে তীর প্রতিরোধ করতে লাগলো। তারা প্রাচীর ও গম্বুজ থেকে আসা তীরের পাল্টা জওয়াব দিল দূর পাল্লার তীর নিক্ষেপ করে।

দূর পাল্লার তীর নিক্ষেপ শুরু হলে শত্রুদের তীর নিক্ষেপ বন্ধ হয়ে গেল। এই সুযোগে মেয়েরা আহতদের উঠিয়ে গাছের আড়ালে নিয়ে গেল।

আবার হামলা করলো নাইটরা। মুসলিম সৈন্যরা এবার প্রতিহত করলো তাদের আক্রমণ। উভয় পক্ষে আহত নিহত হচ্ছিল।

তুমুল যুদ্ধ উপেক্ষা করে আহত মুজাহিদদের সঙ্গে সঙ্গে তুলে আনছিল মেয়েরা। তাদের তুলে দেয়া হচ্ছিল চিকিৎসকদের হাতে। সেখানে তাদের দ্রুত সেবা ও চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল।

আহত রুগীরা সামান্য সুস্থ্য হয়েই উঠে বসতো। সঙ্গে সঙ্গে তারা দাঁড়িয়ে বলতো, 'এই ক্ষত আমাদের যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। ছাড়ো, আমাদের ময়দানে যেতে দাও।'

তারা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে বলতো, 'আমরা বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করে তবে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করবো।'

যখন আহত সৈন্যরা দেখলো, তিন চারটি মেয়ে তীর বিদ্ধ

হয়েছে তখন তারা এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলো যে, তাদের ক্ষতে ব্যান্ডেজ করাই মুশকিল হয়ে গেল। মেয়েদের এমন দশা দেখে তাদের আবেগ উন্মাদনা আয়ত্বের বাইরে চলে গেল।

মেঞ্জানিক বাহিনী দ্রুত মেঞ্জানিক স্থাপনের কাজ করছিল। তীরন্দাজ বাহিনী তাদের যুদ্ধের গতি তীব্রতর করলো। মেঞ্জানিক স্থাপন করা হয়ে গেলে শুরু হলো মেঞ্জানিক দিয়ে ভারী পাথর ও অগ্নি বোমা নিক্ষেপ।

তারা গোলা ও পাথর দিয়ে আঘাত হানলো প্রাচীরের ওপর। গেট আরেকবার খোলা হলো। নতুন আরেকদল নাইট ঘোড়া নিয়ে বাতাসের বেগে ছুটলো। মুসলিম সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের উপর।

একদল অশ্বারোহী ছুটে গেল তাদের পেছনে। মুহূর্তে তারা অশ্বারোহী বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেল। ক্রুসেড বাহিনীর ফেরার পথ রুদ্ধ করে দিল তারা।

মুসলিম সেনারা নাইটদের অশ্বগুলোকে বর্শা ও তলোয়ার দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করতে লাগলো। নাইটরা তাদের লৌহ বর্মের কারণে সুরক্ষিত ছিল।

ঘোড়া আহত হয়ে পড়ে যেতে লাগলো ময়দানে। ঘোড়ার সাথে নাইটরাও পড়ে যেতে লাগলো। মাটিতে পড়া নাইটদের হত্যা করা তেমন কঠিন হলো না মুজাহিদদের পক্ষে।

নাইটরা সবাই ছিল অশ্বারোহী। সে জন্য সবাইকে ভূপাতিত করা সম্ভব হলো না। বরং তারাও কয়েকজন মুসলমান সৈন্যকে

ভূপাতিত করে চলে গেল।

তারা ফিরে যেতে চাইলে মুসলমান অশ্বারোহীরা তাদের বাঁধা দিতে লাগলো। কেউ কেউ সেই বাঁধা অতিক্রম করে পালিয়ে যেতে পারলেও অনেকেই ধরাশায়ী হলো।

পালিয়ে যাওয়া অশ্বারোহীরা গেটের কাছে পৌঁছতেই সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে গেল। ওরা পেছন দিকে না তাকিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে।

এই ধারা চলতেই থাকলো। দাউদ গম্বুজের সামনেও শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সে যুদ্ধে উভয় পক্ষ সমান বীরত্ব, ক্ষীপ্রতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করতে লাগলো। যুদ্ধের প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছিল, উভয় দলই যুদ্ধের চূড়ান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন। আজই তারা এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি চায়।

ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দাসে উভয় পক্ষ ধর্মীয় উন্মাদনা নিয়ে যুদ্ধ করছিল। যে সব খৃস্টান সেনা আহত হতো, তারা শহর প্রাচীরের বাইরেই পড়ে থাকতো। এই হতভাগাদের উঠিয়ে নেয়ার কেউ ছিল না।

রাত শেষ হলো এভাবেই। সেপ্টেম্বরের অসহ্য গরমের আগাম বার্তা নিয়ে রক্তচক্ষু মেলে উদিত হলো রাঙা সূর্য। যুদ্ধ চলতে লাগলো বিরতিহীনভাবে।

দুপুর। প্রচন্ড রোদ জ্বালিয়ে মারছিল সৈন্যদের। লৌহ পোষাকধারী খৃস্টান নাইটরা জ্বলেপুড়ে মরছিল সে রোদে। সে তুলনায় মুসলিম বাহিনীর অবস্থা ছিল অনেক ভাল।

আহত মুজাহিদদেরকে মেয়েরা উঠিয়ে নিয়ে সেবা শুশ্রুষা

করছিল। তাদের পানি পান করানো আর ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজ করছিল একাগ্রতার সাথে।

পাহাড়ের পাশের ঝর্ণা থেকে মশক ভরে পানি আনছিল কেউ কেউ। দুপুরের উত্তপ্ত সূর্য মাথায় নিয়ে পানি আনতে গিয়ে তাদের আধমরা অবস্থা হয়ে গেল। সুলতান আইয়ুবী এ যুদ্ধ দেখছিলেন আর আবেগে ফেটে পড়ছিলেন।

পাহাড় থেকে ভারী পাথর বহন করে আনার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল খচ্চরের গাড়ী। এই পাথর ব্যবহৃত হচ্ছিল মেঞ্জানিক কামানে।

বিরতিহীন এই যুদ্ধ আরো প্রচন্ড রূপ নিল দুপুরের পর। বিজয় না হওয়া পর্যন্ত যেন কোন দলই থামতে রাজি নয়। প্রাচীরের ওপর থেকে খৃস্টানরা ছুঁড়ছিল দূরপাল্লার কামানের গোলা। মুসলমানরা ছুঁড়ছিল মেঞ্জানিক।

চারদিকে আহতদের চিৎকার, চেঁচামেচি। তীরের শন শন আওয়াজ। এই হট্টগোলের মধ্যেই রাগী সূর্য তার রক্তচক্ষু নিয়ে চলে গেল পশ্চিমের আকাশে।

রাত নামলো। পাথর নিক্ষেপ তখনো চলছিল অব্যাহত গতিতে। মুজাহিদদের পাথর ও অগ্নিগোলা প্রাচীরের ওপর গিয়ে পড়ছিল। কখনো কখনো প্রাচীর পার হয়ে শহরের ভেতরও গিয়ে পড়তো।

অন্যদিকে প্রাচীর এবং গম্বুজ থেকেও গোলা ও পাথর বর্ষণ করছিল খৃস্টানরা। তাদের এক জ্বলন্ত অগ্নিবান গিয়ে পড়লো মুসলিম বাহিনীর এক মেঞ্জানিকের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে তাতে আগুন ধরে গেল। পাশাপাশি আরো দু'তিনটি মেঞ্জানিকে ছড়িয়ে পড়লো সে আগুন। মেঞ্জানিকের সাথে পুড়ে গেল তাতে কর্মরত সৈন্যরাও।

অন্য মেঞ্জানিকগুলো থেকে পাথর নিক্ষেপ চলতেই থাকলো। প্রাচীর এবং গম্বুজ থেকেও গোলা ও পাথর বর্ষণ চলতে থাকলো সমান তালে। তীরও বর্ষিত হচ্ছিল দু'পক্ষ থেকে।

রাতের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হলো। প্রাচীরের বিভিন্ন দিক থেকেও পাথর ও অগ্নিবোমা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল মুজাহিদ বাহিনীর ওপর।

বাইরে কোথাও কোথাও উঁচু টিলা ছিল। সে সব টিলার ওপর সরিয়ে নেয়া হলো বেশ কয়েকটি মেঞ্জানিক। ওখান থেকে যখন পাথর ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ শুরু হলো তখন দেখা গেল, সে সব গোলা প্রাচীর পার হয়ে শহরের ভেতরে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। মুজাহিদরা এবার পাথর বাদ দিয়ে সলতেওয়ালা জ্বলন্ত তীর নিক্ষেপ শুরু করলো শহরের বিভিন্ন স্থানে। সঙ্গে সঙ্গে সে সব জায়গায় আগুন ধরে গেল। ধোঁয়া ও আগুনের শিখা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল।

তিন ধরনের খৃস্টান সেনা ছিল শহরে। একদল যারা পুর্ব থেকেই শহরে ছিল। যুদ্ধের এ পর্যায়ে এসেও তাদের মনোবল ছিল দৃঢ়। কিন্তু অন্য স্থান থেকে যেসব সৈন্যরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল শহরে, তাদের কারো কারো মনে ছিল প্রতিশোধের স্পৃহা। তবে পালিয়ে আসা অধিকাংশ সৈন্যদের

মনেই কাজ করছিল ধ্বংসের বিভীষিকা।

যদিও ওরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করছিল, কিন্তু তাদের মনোবল ছিল একেক জনের একেক রকম। শহরের সৈন্যরা তখনো সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিতে পারবে এমন ধারনা নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। তারাই বার বার নাইটদের সঙ্গে গেট দিয়ে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করছিল মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে।

অন্য এক গেট দিয়ে এবার বেরিয়ে এলো আরেকদল নাইট সৈন্য। তারা বেরিয়েই অবরোধকারী সৈন্যদের উপর আক্রমণ শুরু করলো।

তাদের মনোবল সতেজ থাকলেও শহরবাসীর মনোবল ছিল সৈন্যদের থেকে পৃথক। এই শহরে তখন অবস্থান করছিল আক্রা ও আসকালান থেকে পালিয়ে আসা শরনার্থীরা। তারা আগে থেকেই আতংকগ্রস্ত ছিল, সুলতানের বাহিনী শহর অবরোধ করেছে জেনে তারা সমস্ত শহরে আতঙ্কের গুজব ছড়িয়ে দিল।

তারা বললো, 'সুলতানের বাহিনীতে জ্বীন আছে। জ্বীনেরা সুলতানের পক্ষে যুদ্ধ করে বলেই অল্পসংখ্যক হয়েও তারা আমাদের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে যায়।

আমরা নিজের চোখে জ্বীনদের তান্ডব দেখেছি। তারা মুহূর্তে আমাদের সামনে কয়েকটি গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। তারা বাতাসের ওপর ভর দিয়ে চলে এবং মুহূর্তে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে।' এ

ধরনের গুজবে শহরে আতঙ্ক বন্যার পানির মত একটু একটু করে বেড়ে যাচ্ছিল।

বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত গীর্জা থেকে ক্রমাগত ঘন্টা ধ্বনি বাজছিল। যুদ্ধের তান্ডবে রাত ও দিন সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। শহরের খৃস্টানরা গীর্জায় জড়ো হয়ে পাদ্রীর সাথে সুর মিলিয়ে উচ্চস্বরে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে লাগলো।

শহরের বাইরে সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিল। সেই তাকবীর ধ্বনির আওয়াজ শহরের ভেতর থেকেও শোনা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন বাইরে মেঘ গর্জন করছে।

মেঞ্জানিকের অগ্নিতীর লেগে শহরের বিভিন্ন জায়গায় আগুন ধরে গেলে শহরের মধ্যে ভীতির এক স্রোত বয়ে গেল। জ্বলন্ত অগ্নিশিখা যেন আতঙ্কগ্রস্ত খৃস্টান নাগরিকদের শেষ মনোবলটুকুও নিঃশেষ করে দিল।

সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা, যারা খৃস্টান ছদ্মবেশে শহরের মধ্যে ছিল তারা আগুনের মধ্যে ঘি ঢালার কাজ করছিল। তারা এমন ভয় পাওয়ার ভান করছিল যাতে শহরের খৃস্টানরা মানসিকভাবে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে।

তারা নানা রকম ভয়ংকর গুজব ছড়িয়ে লোকের মধ্যে আতঙ্কের পাহাড় চাপিয়ে দিচ্ছিল। একজন বললো, 'শুনেছি সুলতান আইয়ুবী জেরুজালেম দখল করতে চান না। তিনি নাকি শহরটা ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে সমস্ত খৃস্টানদের হত্যা করবেন।'

'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি, তিনি নাকি সৈন্যদের হুকুম দিয়েছেন,

এমনভাবে হামলা চালাবে যাতে এখানে কোনদিন শহর ছিল তার চিহ্নও না থাকে। কোন খৃস্টানকে বাঁচতে দেবে না। তবে তাদের কোন যুবতী মেয়ে যদি তোমাদের পছন্দ হয়ে যায় তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারো, তাতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।' বলছিল অন্য কেউ।

তাদের মধ্যে নতুন আতংকের বাণী প্রচার করলো সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারা। তারা বলতে লাগলো, 'শুনেছো, আমাদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক আক্রার সবচে বড় ক্রুশ চিহ্নটি নাকি এখন সুলতান আইয়ুবীর হাতে। পাদ্রীরা বলেছেন, এই ক্রুশ যার হাতে থাকে সে পরাজিত হয় না। তাহলে এখন উপায়!'

ক্রমে এ খবর ডালপালা মেলতে লাগলো। আক্রা থেকে আগত শরনার্থীরা স্বীকার করলো এর সত্যতা। তারা বললো, 'ঈশ্বর নাকি খৃস্টান সম্রাটদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ক্রুশটি সুলতান আইয়ুবীর হাতে তুলে দিয়েছেন।'

কেউ কেউ আরেকটু বাড়িয়ে বললো, 'শুনেছি সুলতান আইয়ুবী ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ নিয়েছেন। ঈশ্বরের অভিশাপপ্রাপ্ত খৃস্টান সম্রাট ও তার দোসরদের তিনি কিছুতেই রেহাই দেবেন না। এর অর্থ হলো, ইসা মসীহ এখন খৃস্টান সম্রাটদের উপর নারাজ।' এসব কথা যে সত্য তার প্রমাণ তো তারা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে। ঈশ্বর নারাজ না হলে এ রকম জাদরেল নাইটরা সামান্য সৈন্যদের হাতে মারা যায়!

ইতিহাস থেকে জানা যায়, আইয়ুবীর গোয়েন্দারা সে সময়

সুকৌশলে খৃষ্টানদের মনে তাদের অতীত পাপের জন্য ভীষণ ভয় জাগিয়ে তুলেছিল।

খৃষ্টানরা বায়তুল মোকাদ্দাস জয়ের পর সেখানে মুসলমানদের ওপর যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লোকজন একে অন্যকে দোষারোপ করছিল। তারা বলছিল, 'মনে নেই, আমাদের সৈন্যরা শিশুদেরকে বর্শার আগায় বিদ্ধ করে আনন্দ নৃত্য করেছিল? মুসলমান মহিলা ও যুবতীদের উপর বলাৎকার করেছিল? মসজিদের ভেতর তাদের উলঙ্গ লাশ ফেলে রেখেছিল? তাদের পবিত্র ঘর মসজিদ এবং পবিত্রগ্রন্থ কোরআনের অবমাননা করেছিল? আল্লাহ এত অত্যাচার সইবেন কেন?'

এ কথার রেশ ধরেই হয়তো অন্য জন বলছিল, 'নব্বই বছর ধরে সেই অভিশাপ আমাদের মাথার ওপর ঘুরপাক খেয়েছে। যিশুর পরম প্রেমের বাণী ভুলে আমাদের পূর্ব পুরুষরা মুসলমানদের উপর যে উৎপীড়ন ও নির্যাতন চালিয়েছিল তার শোধ নেয়ার জন্য প্রভু এই গজব পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের ওপর।'

খৃস্টানদের জঘন্য বর্বরতার শিকার মুসলমানরা এসব কথায় নতুন করে প্রাণ পাচ্ছিল আর খৃস্টানরা এসব কথা স্মরণ করে পাপের প্রায়শ্চিত্য করার জন্য গীর্জায় গিয়ে পাদ্রীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।

বর্তমান যুগের পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক এন্থনী এলিয়েট অনেক ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, সে সময় বায়তুল

মোকাদ্দাসে খৃস্টানরা অবরোধের কারণে চরম বিভীষিকার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। এই আমেরিকান ঐতিহাসিক আরো লিখেছেন, অবরোধের সময় অনেক খৃস্টানকে শহরের গলিতে গলিতে ঘুরে বুক চাপড়াতে দেখা গেছে। কেউ কেউ রাস্তায় ঘুরে নিজেই নিজেকে চাবুক মারতো আর মাতম করতো। ওরা মনে করতো, এটা খোদার কাছে পাপ ক্ষয়ের এক পদ্ধতি।

যাদের যুবতী মেয়ে ছিল তার মা তাদের মাথার চুল ন্যাড়া করে দিয়েছিল। তাদের বি স ছিল, এতে প্রভু সদয় হয়ে মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা করবেন।

পাদ্রীরা নাগরিকদের মন থেকে এই ভয় দূর করার জন্য ক্রমাগত নছিহত করে যাচ্ছিলো। কিন্তু কোন নছিহতই তাদের মন থেকে এই ভীতি দূর করতে পারছিল না।

মুসলমানদের অবস্থা ছিল এমন, সেখানে তিন হাজারের অধিক মুসলিম নর-নারী ও শিশু কয়েদখানায় বন্দী ছিল। আর যারা বাড়ীতে ছিল তারাও ছিল মূলতঃ গৃহবন্দী। তারা খৃস্টানদের ভয়ে মসজিদে যেতেও সাহস পেতো না। সুলতান আইয়ুবীর অবরোধের সঙ্গে সঙ্গেই সকল মুসলমান জেনে গেলো, সুলতান আইয়ুবী বায়তুল মোকাদ্দাস অবরোধ করেছেন।

গৃহবন্দী মুসলমানরা খৃস্টানদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা লক্ষ্য করে সাহসী হয়ে উঠলো। তাদের দুরন্ত যুবকরা বাড়ীর ছাড়ে উঠে আজান দিতে আরম্ভ করলো। যারা কয়েদখানায় ছিল তার সজোরে কোরআন পাঠ শুরু করে দিল। কেউ বা উচ্চস্বরে দোয়া দরুদ পাঠ করতে লাগলো। নারী ও শিশুরা, যারা গৃহবন্দী

ও জেলবন্দী ছিল তারা সবাই দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে লাগলো। তারা আইয়ুবীর বিজয় চেয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে লাগলো।

খৃষ্টানরা তাদের কার্যকলাপ দেখছিল, কিন্তু কিছু বলার সাহস বা শক্তি তখন তাদের ছিল না। কারণ তারা বুঝতে পারছিল, তাদের অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিফল ভোগ করার সময় এসে গেছে। তারা আসন্ন শাস্তির ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তাই মুসলমানদের আজান ও কোরআন পাঠের শব্দ শুনেও তারা কোন টু শব্দও করছিল না।

মুসলমান যুবকরা যখন খৃষ্টানদের এ অবস্থা দেখলো তখন তারা পথে নেমে এলো। তারা অলি গলিতে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো, 'ইমাম মেহেদী এসে গেছেন, আমাদের মুক্তি আসন্ন। মুসলমানরা, ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসো। শহরের দেয়াল ভেঙ্গে আসতে দাও মুক্তিদূতকে। শহরের গেট খুলে দাও।'

তখন শহরের মধ্যে শুরু হয়ে গেল হক ও বাতিলের প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব। গীর্জায় ঘন্টাধ্বনি ও আজানের সংঘর্ষ চলতে লাগলো শহর জুড়ে। আর বাইরে ঘোড়া, তলোয়ার, বর্শা ও তীর নিয়ে মহা সমরে নেমে পড়েছে খৃস্টান ও মুসলিম শক্তি।

গীর্জায় ঘন্টা যত বেশী জোরে বাজে তারচে জোরে শোনা যায় আজানের ধ্বনি। বাড়ীতে বাড়ীতে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ বেড়ে যায়। ছোট ছোট শিশুরাও আল্লাহু আকবার ধ্বনি নিয়ে নেমে আসে রাস্তায়।

কিন্তু বাইরে তখন কেয়ামতের তান্ডব বইছে। সুলতান

আইয়ুবীর সৈন্যরা জীবন বাজি রেখে চেষ্টা করছে দেয়াল ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশের। প্রাচীরের উপর থেকে বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ করে খৃস্টানরা চেষ্টা করছে তাদের ঠেকিয়ে রাখার। বাইরে যেসব নাইট যোদ্ধা কমান্ডো আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে বসেছিল তারা সুলতানের বাহিনীর ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালাতে লাগলো বার বার।

সুলতানের সৈন্যরা মেঞ্জানিক থেকে অনবরত নিক্ষেপ করছিল পাথর ও অগ্নিগোলা। প্রাচীরের ওপর গম্বুজ থেকে কামান দাগছিল খৃস্টানরা। পাথর বহনকারীদের শরীরগুলো রক্তাক্ত হয়ে উঠছিল। লৌহবর্ম পরা নাইটরা হাঁপিয়ে উঠছিল অস্ত্রের ভারে। বাইরে ভেতরে চলছিল তুমুল লড়াই।

রক্তাক্ত সমরণাঙ্গনে লড়ছে দুই জানবাজ বাহিনী। এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, বিশ্বাস ও চেতনার যুদ্ধ। তাই বেঁচে থেকে কেউ পরাজয় মেনে নিতে রাজি নয়।

সমুদ্র উপকুল থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ভূমধ্যসাগরে আল ফারেসের ছয়টি যুদ্ধ জাহাজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাহারা দিচ্ছে সমুদ্র পথ। টায়ার সমুদ্র বন্দরে খৃষ্টানদের আর কোন সমুদ্র জাহাজ যাতে ভিড়তে না পারে সে জন্য রাখছে বিশেষ নজর। কোন অস্ত্র ও রসদবাহী খৃষ্টান জাহাজ দেখলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত নৌসেনারা।

মেয়ে দুটি তখনো জাহাজেই ছিল। আল ফারেসের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল সুলতানের চূড়ান্ত হামলার খবর। টানটান

উত্তেজনা নিয়ে তিনি তদারক করছিলেন বাহিনীর প্রস্তুতি। সবাইকে যুদ্ধের জন্য সতর্ক করে প্রস্তুত অবস্থায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন ডিউটিতে। ফলে মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দেয়ার মত সময় কারো ছিল না।

অভিযান শুরু করার মুহূর্তে সুলতান আইয়ুবী আল ফারেসকে তার বিরাট দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। আল ফারেস সে কথা মনে গেঁথে নিয়ে ছুটছিলেন এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে। কখনও নিজে জাহাজের মাস্তুলের মাথায় বাঁধা মাচানে বসে দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখতেন কোন যুদ্ধ জাহাজ ধরা পড়ে কিনা দৃষ্টিসীমায়। আবার নেমে গিয়ে দেখতেন নৌসেনারা যার যার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছে কিনা?

এই সুযোগে দায়িত্ব পালনের নাম করে রউফ কুর্দী দেখা করতো ফ্লোরীর সাথে। তারা দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিত গোপন সাক্ষাতে। সবাই যার যার দায়িত্বে ব্যস্ত থাকায় এদিকে নজর দেয়ার কেউ ছিল না। সবার অজান্তেই চলছিল তাদের এ গোপন অভিসার।

কিন্তু একজন, হাসান বিন আবদুল্লাহর কাছ থেকে মেয়েদের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব নিয়ে যে গোয়েন্দা এসেছিল সে তাদের দু'জনের মেলামেশা ঠিকই টের পেলো এবং সে তাদের গতিবিধির ওপর গভীর দৃষ্টি রাখতে শুরু করলো।

মিশরের নৌবহর ভুমধ্যসাগরে দূর দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। কারণ ভয় ছিল, ইউরোপ, বিশেষ করে ইংল্যান্ড

থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসে রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জাহাজ আসতে পারে।

সুলতান আইয়ুবীর ক্ষীপ্র গতির অভিযান ও খৃষ্টানদের সমস্ত কেল্লা ও ফাঁড়ি দখলের ভয়ে জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ডকে খবর পাঠালেন, 'আরবরা খৃষ্টান ও ক্রুসেডারদের নিপাত করে চলেছে। বায়তুল মোকাদ্দাস রক্ষা করা দূরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি জেরুজালেমে দ্রুত সাহায্য পাঠান, নইলে জেরুজালেম আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।'

তিনি আরো লিখলেন, 'জেরুজালেম একবার আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলে তার জন্য আমাদের মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হবে। আমি আবারও আপনাকে অনুরোধ করছি, দেরী না করে আপনি জেরুজালেম রক্ষায় এগিয়ে যান।

আমরা যারা ক্রুসেড যুদ্ধের শপথ নিয়েছি তাদের কাছে নিজের দেশ আর অন্য খৃস্টান দেশে কোন পার্থক্য নেই। জেরুজালেমে আঘাত হানতে এসে আইয়ুবী মূলতঃ আমাদের সবাইকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছে।'

সুলতান আইয়ুবীর ধারনা ছিল, বায়তুল মোকাদ্দাসের যুদ্ধ ভূমধ্যসাগরেও চলবে আর সে যুদ্ধ হবে ভয়ংকর। কিন্তু জার্মানী ও ইংল্যান্ড থেকে তখনো পর্যন্ত তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

পরাজিত খৃস্টান নৌবহরের জাহজাগুলো টায়ার বন্দরে নোঙ্গর

করা ছিল। তাদের কোন তৎপরতা না দেখে এই নিরবতা ভয়ংকর কোন হামলার আলামত কিনা এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়লেন সুলতান আইয়ুবীর নৌবাহিনী প্রধান। তিনি শত্রুর এই নিরবতাকে ভয়ের আলামত মনে করে সতর্কতা আরো বৃদ্ধি করার কথা ভাবলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বার্তা পাঠালেন এ্যাডমিরালদের কাছে।

বায়তুল মোকাদ্দাস অবরোধের চতুর্থ রাত। এখনো পর্যন্ত যুদ্ধের গতিতে কোন পরিবর্তন আসেনি, মুহূর্তের জন্য থামেনি কোন পক্ষ। ফলে সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরূপণের কোন অবস্থা এখনো সৃষ্টি হয়নি।

খৃস্টান নাইট ও তাদের সহযোদ্ধারা শহরের বাইরে এসে যেমন বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করছিল তেমনি বীরত্বের সাথেই লড়ছিল আইয়ুবীর জানবাজ বাহিনী।

সুলতান আইয়ুবী যখন দেখলেন চার দিন চলে যাওয়ার পরও খৃস্টান সৈন্যদের আবেগে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি তখন তার মাথা ঘুরে গেল। যদিও তখনো পর্যন্ত যথেষ্ট সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাঁর হাতে তবু খৃস্টানদের এই জোশ তাকে চিন্তায় ফেলে দিল। বিশেষ করে বিজিত কেল্লা ও শহর থেকে পাওয়া বহু অস্ত্রশস্ত্র জমা পড়েছিল মুসলমানদের হাতে। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা কমে যাচ্ছিল দ্রুত।

সুলতান আইয়ুবী তাকিয়ে ছিলেন বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রাচীরের দিকে। তাঁর মনে হলো সেই বিরাট পাথর প্রাচীর তাঁর

সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে দুর্বোধ্য হাসি হাসছে।

পঞ্চম দিনে সুলতান আইয়ুবী পশ্চিম দিক অর্থাৎ দাউদ গম্বুজের সামনের ক্যাম্পটি উঠিয়ে দিলেন। সেখানকার যুদ্ধ বন্ধ করে তাদের সরিয়ে নিলেন উত্তর দিকে। উত্তর দিকে প্রাচীরের এক জায়গা তার কাছে কিছুটা দুর্বল মনে হলো।

সুলতান আইয়ুবী যখন পশ্চিম দিক থেকে ক্যাম্প উঠিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল, তিনি বোধ হয় অবরোধ উঠিয়ে নিচ্ছেন। প্রাচীরের উপরে যে সব খৃস্টান সৈন্য ছিল তারা শহরে প্রচার করে দিল, 'অবরোধ উঠে যাচ্ছে, মুসলমান সৈন্যরা পিছু হটে যাচ্ছে।'

সুলতান আইয়ুবীর পশ্চিম দিকের সৈন্যবাহিনী ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল। তারা সেখান থেকে সম্পূর্ণ সরে পড়ার আগেই আবারও একটি সন্ধ্যা নেমে এলো। শহরে খৃস্টান বাসিন্দাদের মধ্যে যেখানে ক্রন্দন ও আহাজারী শুরু হয়ে গিয়েছিল সেখানে আবার আনন্দের হিল্লোল এসে গেল।

রাতে সমস্ত খৃষ্টান গীর্জায় একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের আরাধনায় মেতে উঠলো। খৃষ্টানরা সন্ধ্যা পর্যন্ত অতীতের পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিল, কিন্তু দেখা গেল, সন্ধ্যার পর তাদের প্রার্থনার ভাষা বদলে গেছে। তারা এখন শহরের মুসলমানদের নির্মূল করার শক্তি প্রার্থনা করতে লাগলো।

অন্য দিকে এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে মুসলমানরা একদম নিরব ও নিথর হয়ে গেল।

পরের দিন। ১১৮৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। দিনটি ছিল জুম্মা

বার। খৃষ্টানরা সারা রাত প্রার্থনা করে সকালে প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে দেখলো, উত্তর দিকে জায়তুন পাহাড়ের উপর সুলতান আইয়ুবীর পতাকা উড়ছে।

তার একটু আগে প্রাচীরের কিছু দূরে মেঞ্জানিক স্থাপন করা হয়েছে। কমবেশী দশ হাজার তীরন্দাজ, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য আক্রমণের জন্য হুকুমের অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে ওরা ধারনা করলো, শুক্রবার মুসলমানদের পবিত্র দিন। হয়তো সুলতান আইয়ুবী শুক্রবার দিন জুম্মার খুৎবা দেয়ার জন্য সৈন্য সমাবেশ করেছেন। কিন্তু একটু পরই তাদের ভুল ভাঙলো।

সুলতান আইয়ুবী সব সময় শুক্রবার দিন যুদ্ধ শুরু করতেন। সুলতান আইয়ুবী নতুন উদ্যমে নতুন পরিকল্পনায় আবার বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধারের যুদ্ধ শুরু করলেন।

শহরের উপরে নতুন করে শুরু হলো পাথর ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ। আগের চেয়ে এ আক্রমণ ছিল অনেক বেশী তীব্র ও ব্যাপক। শহরে গুজব ছড়িয়ে গেল, সুলতান আইয়ুবীর আরও বহু সৈন্য এসে যুদ্ধে শামিল হয়েছে, এখন শহরের পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

শহরে যেন কিয়ামত শুরু হয়ে গেল। লোকেরা ঘরবাড়ী ছেড়ে রাস্তায় হা-হুতাশ ও ছুটাছুটি করতে লাগলো। মুসলমানদের মধ্যে আবার ফিরে এলো উদ্যম। তারা আবার ছাদে উঠে আজান দিতে শুরু করলো।

খৃষ্টানদের করুণ অবস্থা বুঝতে পেরে পাদ্রী ক্রুশ হাতে নেমে এলেন রাস্তায়। তিনি শহরের রাস্তায়, অলিতে গলিতে সেই ক্রুশ দেখিয়ে লোকদের শান্তনা দিতে লাগলেন। নিরাশ ও ক্রন্দনরত জনগণকে সান্তনা দেয়ার জন্য তিনি তাদের নিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

ক্রুসেড বাহিনী শেষবারের মত সুলতান আইয়ুবীর মেঞ্জানিকের উপর আক্রমণ চালালো। সুলতান আইয়ুবী এখন যুদ্ধের পরিচালনা নিজ দায়িত্বে নিয়েছিলেন। তার দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী দল ক্ষীপ্রগতিতে তিন দিক থেকে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই বাহিনী নিমেষে সামনে যাকে পেলো তাকেই পিষে মারলো।

ক্রুসেড বাহিনী আর সামনে অগ্রসর হতে পারলো না। হামলা করার পরিবর্তে এবার তারা প্রতিরোধ করতে শুরু করলো। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী সমস্ত শক্তি এক করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবার। স্রোতের মত সুলতানের বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছিল প্রাচীর ও ফটকের দিকে।

দুই বাহিনী মুখোমুখি থাকায় তীরন্দাজ বাহিনী তীর ছুঁড়তে পারছিল না। ফলে লড়াই হচ্ছিল মূলতঃ অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যে।

মুসলমানরা এই প্রথম বড় ধরনের হামলা করলো। এই হামলায় নিহত হলো ক্রুসেড বাহিনীর অনেক সদস্য এবং নাইটরা। লাশের স্তুপ রেখে পিছু হটলো খৃস্টান বাহিনী। সুলতানের অশ্বারোহী দলও ফিরে এলো তীরন্দাজদের আওতার

বাইরে। এরপর ক্রুসেড বাহিনী আরও দু'বার বাইরে এসে আক্রমণ চালালো মুজাহিদদের ওপর। কিন্তু মুসলমানদের জানবাজ অশ্বারোহী বাহিনী তাদের গেটের বাইরে বেশী দূর অগ্রসর হতে দিল না।

সুলত্বান আইয়ুবী এবার তার প্রাচীর ভাঙ্গার একদল জানবাজকে হুকুম দিলেন উত্তরের অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাচীরের পাশে ছুটে যেতে। তারা প্রত্যেকে হাতে লোহার ঢাল নিয়ে ছুটলো প্রাচীরের দিকে।

তাদের আপাদমস্তক তারা ঢাল দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। প্রাচীর থেকে তীর বর্ষণের ভয় ছিল বলে সুলতান আইয়ুবী তাঁর তীরন্দাজ বাহিনীকে আগেই মুষলধারে তীর বর্ষণ করার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। ফলে ব্যাপক তীর বর্ষণের কারণে খৃস্টান তীরন্দাজরা পিছু হটে গিয়েছিল।

এই সুযোগে প্রাচীর ভাঙ্গা বাহিনী ছুটে গিয়ে প্রাচীরের কাছে আশ্রয় নিল এবং নিজেদেরকে প্রাচীরের সাথে লাগিয়ে রাখলো। ক্রুসেড তীরন্দাজদের নিচে তাকানোর কোন সুযোগ ছিল না। সুলতানের তীরন্দাজ বাহিনীর তীর বর্ষণ তেমনি অব্যাহত ও তীব্র রইলো। এই সুযোগে দেয়াল ভাঙ্গার কাজে লেগে গেল সেখানকার সৈন্যরা। এই জায়গাটা ছিল শহরের পেছন দিক। এখানে একটা ছোট দরজা ছিল খিড়কি দরজার মত। দরজার উপরে ছিল শক্ত প্রাচীর।

সুলতানের বাহিনী সহজেই প্রথম দরজাটা ভেঙে ফেললো। কিন্তু দেখা গেল দরজার পেছন দেয়ালে আরো একটা শক্ত

দরজা। সেই দরজার পেছনে আবার নিরেট দেয়াল।
ওরা প্রথম দরজা ভেঙে দ্বিতীয় দরজাও ভেঙে ফেললো। দেখা গেল দরজার পাশ দিয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে সিঁড়ি।
সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই ওরা দেখতে পেলো তারা একটি রুমে এসে পড়েছে। কিন্তু এই রুম থেকে শহরে ঢুকার কোন দরজা তারা খুঁজে পেলো না। এমনকি প্রাচীরের ওপর উঠে যাওয়ারও কোন সুড়ং পথ বের করতে পারলো না তারা। কিন্তু প্রাচীরের গায়ে কামরা থাকায় এ অংশটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল।
ওরা কামরা থেকে বেরিয়ে এসে কামরার অংশটি চিহ্নিত করে দাগ দিল। তারপর একজন ছুটে গিয়ে এই খবর জানালো সুলতানকে।
সুলতান দেখলেন দাগ দেয়া অংশটি। বুঝলেন এটি একটি সেন্ট্রিবক্স। পেছন দিকে নজর রাখার জন্য এ বক্সটি তৈরী করা হয়েছে। নিশ্চয়ই শহর থেকে এ বক্সে আসার জন্য কোন সুড়ং আছে। হয়তো মেঝেতে পাথর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সেই সুড়ং মুখ। আবার এমনও হতে পারে, দেয়ালেরই কোন অংশে সেই সুড়ং মুখটি আছে।
যাই হোক, সুলতান এ নিয়ে গবেষণা না করে সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গীর আমলের তৈরী ভারী ও মজবুত মেঞ্জানিক দিয়ে সেই দাগ দেয়া অংশে ভারী ভারী পাথর নিক্ষেপ শুরু করলেন।
দেয়াল খুবই মোটা ও পুরু ছিল। কিন্তু অনবরত বিরাট বিরাট পাথর নিক্ষেপের ফলে দেয়াল ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো। কামরার বাইরের দিকের অংশ ভেঙে গিয়ে ভেতরের দেয়ালে

সৃষ্টি হলো ফাটল। পাথর নিক্ষেপের বিকট শব্দে শহরবাসীর রক্ত শুকিয়ে হিম হয়ে যাচ্ছিল।

দিনের বেলা প্রাচীরের দাগ দেয়া অংশের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল প্রাচীর ভাঙ্গার দলটি। দিনভর পাথর নিক্ষেপের ফলে সেখানে পাথরের স্তুপ জমে গিয়েছিল। দেয়ালেও ফাটল ধরে ছিল।

রাত নেমে এলো। সুলতান মেঞ্জানিক নিক্ষেপ বন্ধ করে ওদের ইশারা করলেন কাজ শুরু করতে। তারা বিরাট বিরাট পাথর সরিয়ে পৌঁছে গেল দেয়ালের ফাটলের কাছে।

মাথার ওপরে ঢালের মত ঝুঁকে ছিল কামরার ছাদ। ফলে উপরের তীরন্দাজদের তীর নিক্ষেপের ভয় আর রইলো না তাদের। তারা নিশ্চিন্ত মনে দেয়ালের গায়ে সুড়ং খোদাই করতে শুরু করলো।

উপর থেকে কোন তীর তাদের আঘাত করতে পারবে না জানার ফলে কাজ এগুলো খুব দ্রুত। রাতের মধ্যেই কয়েকশো জানবাজ মুজাহিদ ত্রিশ গজের মত লম্বা সুড়ং করে ফেললো সেখানে। তাদের মাথার ওপর ছিল দালান ঘরের ছাদ ও কাঠের বিম।

রাত ভোর হওয়ার আগেই সুলতান খবর নিলেন কাজ কত দূর এগিয়েছে। তিনি যখন জানতে পারলেন ত্রিশ গজের মত বিশাল একটি সুড়ং সেখানে তৈরী করতে পেরেছে মুজাহিদরা তখন তিনি তাদের সেখান থেকে সরে আসার হুকুম দিলেন।

এবার ওখানে অভিযানের দায়িত্ব নিল একদল কমান্ডো।

সুলতান আইয়ুবী তাদের বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে। কমান্ডো বাহিনী এগিয়ে গেলো সুড়ংয়ের কাছে। তারা সুড়ংয়ের মধ্যে শুকনো ঘাস ও খড়ি এনে জড়ো করলো। তারপর তাতে ছিটিয়ে দিল পেট্রোল। শেষ মাথায় ভরে দিল একগাদা বিস্ফোরক।

তারপর সেখান থেকে সমস্ত জানবাজ দ্রুত সরে আসার আগে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। একটু পর প্রচন্ড বিস্ফোরণে ধ্বসে গেল সমস্ত দালান ও প্রাচীর। দালান ও প্রাচীর ভাঙলো ঠিকই কিন্তু ভাঙা টুকরোগুলো উপরে উঠে আবার যখন নিচে নেমে এলো তখন সেখানে পাথরের বিশাল স্তুপ জমে গেল।

এই স্তুপীকৃত ধ্বংসস্তুপের উপর দিয়ে শহরে প্রবেশ করা আগের মতই কঠিন হয়ে রইলো। সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের নির্দেশে শুরু হয়ে গেল ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ।

জেরুজালেম শহরের মানুষ আরো একটি দুর্লভ সূর্যোদয় দেখার সুযোগ পেলো। রাতে তারা ধরেই নিয়েছিল আগামীকালের সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য আর তাদের হবে না। বিশেষ করে ভোর রাতের বিকট শব্দ তাদের বলছিল, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের স্বর্গে পাড়ি জমাতে হবে। এমন শব্দ শোনার জন্যও আর তাদের জায়গা হবে না এ পৃথিবীতে।

এই বিস্ফোরণের পর গীর্জার ঘন্টাধ্বনির শব্দ আরও তীব্রতর হয়ে উঠলো। জোরালো কণ্ঠের আজানের শব্দও ভেসে আসতে লাগলো অনবরত।

ক্রুসেড বাহিনীর জেনারেল ও সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে গেল। জেনারেলরা এক জরুরী বৈঠকে বসলো। সেখানে জেনারেলরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বললো, 'শহরে যত সৈন্য ও খৃস্টান আছে সবাইকে নিয়ে এক সাথে বাইরে গিয়ে হামলা করা উচিত আমাদের।'

জেনারেল হারকিউলিস এ মত সমর্থন না করে বললো, 'এখন পরাজয়ের মুখে শহরে শুধু নারী ও শিশুদের রেখে গেলে তারা মুসলমান বাহিনীর প্রতিহিংসার শিকার হবে!'

অন্য একজন প্রস্তাব করলো, 'যুদ্ধের যা অবস্থা তাতে সুলতানের সাথে আমাদের আপোষ রফা করা উচিত।'

ব্যাপক আলোচনার পর ক্রুসেড জেনারেল ও সেনাপতিরা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, 'সুলতান আইয়ুবীর সাথে শান্তির জন্য আপোষ প্রস্তাব দেয়া হবে।' এই আপোষ প্রস্তাব দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হলো প্রখ্যাত খৃস্টান নেতা সরদার বালিয়ানের উপর।

সূর্যের উত্তাপ তখনো প্রখর হয়নি। বাইরে থেকে সুলতান আইয়ুবী লক্ষ্য করলেন, তারা যে স্থানটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিলেন তার ওপাশে একটি সাদা নিশান উড়ছে।

তিনি তার বাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধ করার হুকুম দিলেন। তীরন্দাজরা তীর চালনা থামিয়ে দিল। বন্ধ হয়ে গেল মেঞ্জানিকের বোমা বর্ষণ।

একটু পর। সুলতান আইয়ুবী দেখলেন শহরের ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে চার ব্যক্তি। তাদের হাতে সাদা পতাকা। তারা

মুসলিম বাহিনীর কাছে এসে বললো, 'আমরা সুলতান আইয়ুবীর কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।'

সুলতান আইয়ুবী তার প্রহরীদের বললেন 'ওদের স্বসম্মানে আমার এখানে নিয়ে এসো।'

সুলতান আইয়ুবী তাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাদের নিয়ে নিজের তাবুতে প্রবেশ করলেন।

আলোচনা শুরু করলেন খৃষ্টান সরদার বালিয়ান। বললেন, 'আগে মুসলিম অবরোধ উঠিয়ে নেবেন। তারপর আপনার শর্ত নিয়ে আমরা আলোচনায় বসবো।'

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'কিন্তু অবরোধ উঠিয়ে নেবো কোন শর্তে? আপনারা কি বায়তুল মোকাদ্দাস ছেড়ে দিতে সম্মত আছেন? তাহলে আপনারা শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসুন, আমি আমার অবরোধ তুলে নিচ্ছি।'

'না, বায়তুল মোকাদ্দাস ছাড়ার জন্য প্রস্তুত নই আমরা।'

'তাহলে আমার পক্ষেও অবরোধ উঠিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আগে আমি বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত করি। তারপর আপনাদের যে কোন আলোচনাই আমি শুনতে প্রস্তুত।'

'দেখুন, এখনও আপনার একটি সৈন্যও শহরে প্রবেশ করেনি। আপনি এমন দাবীও করতে পারেন না যে, আপনি শহর অধিকার করে নিয়েছেন। বরং এখনও খৃস্টান সৈন্যরাই শহরের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে। আমরা অধিক রক্তক্ষয় এড়ানোর জন্য আপনার কাছে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম।'

'আমিও অধিক রক্তপাত চাই না। শান্তি আলোচনার জন্য আমি সব সময় প্রস্তুত। কিন্তু চুক্তি হওয়ার আগে আমরা আমাদের অবস্থান ছাড়তে পারি না।'

এভাবেই প্রথম দফা শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল। খৃস্টান প্রতিনিধি দল ফিরে গেল শহরে। সুলতান আইয়ুবী তার সৈন্যদের অবরোধ আরো দৃঢ় করতে হুকুম দিলেন।

প্রথম দফা শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হলে আবার শুরু হয়ে গেল লড়াই। দু'পক্ষই পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ করার জন্য নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে গেলো। সুলতান আইয়ুবী ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীরের পাথর সরিয়ে রাস্তা উন্মুক্ত করার হুকুম দিলেন।

মুজাহিদরা নব উদ্যমে বীরবিক্রমে ধ্বংসাবশেষের পাথর সরানোর কাজে মেতে উঠলো। দুপুরের আগেই শহরে প্রবেশের মত পথ তৈরী হয়ে গেলো। সুলতানের সৈন্যরা সে পথে শহরে প্রবেশ করতে শুরু করলো।

এ সময় আবার বেরিয়ে এলো খৃস্টানদের শান্তি প্রস্তাবকারী দলটি। পেছন দিয়ে মুসলিম সৈন্য শহরে প্রবেশ শুরু করেছে এ খবর তখনো তাদের কানে যায়নি। সুলতান আইয়ুবীর কাছেও এ খবর যায়নি। তাকে শুধু জানানো হয়েছে, 'পাথর সরিয়ে রাস্তা উন্মুক্ত করা হয়েছে।'

সংবাদদাতাকে তিনি বললেন, 'সৈন্যদের শহরে প্রবেশ করতে বলো।' এ সময় খৃস্টান প্রতিনিধি দল আবার সেখানে হাজির হলে তিনি তাদের নিয়ে তাবুর মধ্যে ঢুকে গেলেন। নতুন করে শান্তি আলোচনা শুরু হলো।

এদিকে সুলতানের হুকুম পেয়ে মুসলিম জানবাজরা ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করলো। দেয়াল ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত দলটি মনযোগ দিল পথটি আরো প্রশস্ত করার দিকে। খৃষ্টানরা শহর ছেড়ে দিতে কিছুতেই প্রস্তুত ছিল না। তারা বাঁধা দিল ওদের। দু'পক্ষে আবার তীব্র সংঘর্ষ বেঁধে গেল।

মুসলিম সৈন্যদের মাঝে তখন বিরাজ করছিল এক অভূতপূর্ব অনুভূতি। প্রায় একশো বছর পর আবার মসজিদুল আকসায় প্রবেশের পথ তাদের সামনে এখন উন্মুক্ত। তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। তারা খৃস্টান সৈন্যদের বাঁধা অতিক্রম করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলো।

বাইরে থেকে সৈন্যরা খৃস্টানদের বাঁধা অতিক্রম করে প্লাবনের মত ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলো। খৃস্টানরাও সর্বশক্তি দিয়ে বাঁধা দিল তাদের।

খৃস্টানরা তখন এতটাই মরিয়া হয়ে গেছে যে, তাদের কোন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। তাদের মনে তখন যে ভয়টি সবচে বেশী কাজ করছিল তা হলো, পরাজয়ের অর্থই হচ্ছে মৃত্যু। এতকাল তারা মুসলমানদের ওপর যে অন্যায় অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে মুসলমানরা এবার তার নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। নিশ্চয়ই তারা জেরুজালেমে কোন খৃস্টানকেই আর জীবিত রাখবে না।

তারা ভাবলো, জেরুজালেম দখল করার সময় আমরা যেভাবে ওদের নির্বিচারে হত্যা করেছি তারাও আমাদের সেভাবে হত্যা করে বদলা নেবে। অতএব মরতেই যদি হয় যুদ্ধ করে মরাই

ভাল। ফলে তারা বাঁধার দুর্ভেদ্য দেয়াল দাঁড় করিয়ে দিল শহরে প্রবেশকারীদের সামনে।

খৃস্টানদের ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পড়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে লাগলো শত শত মুসলিম সৈন্য। কেউ মারা গেল তীরন্দাজদের তীরের আঘাতে, কেউ বর্শার আঘাতে। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরাও বেপরোয়া। তারা বাঁধাদানকারীদের পদদলিত করে সামনে এগিয়ে চললো।

যুদ্ধ এক ভয়াবহ রক্তাক্ত রূপ ধারন করলো। যারা প্রবল বাঁধা ডিঙিয়ে ঢুকে পড়েছিল শহরে তারা শহরের রাস্তায় রাস্তায় খৃস্টান সৈন্য ও যুবকদের আক্রমণের শিকার হলো।

মুসলিম জানবাজরা তখনো স্রোতের মতো ঢুকছে শহরে। ইতিমধ্যে শহরে ঢুকে পড়া একদল মুসলিম সৈন্য বাঁধা মাড়িয়ে শহরের প্রধান ফটক খুলে দিল।

শহরের রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয়ে গেল তলোয়ারের ঠোকাঠুকি। একশো বছর পর আবার বায়তুল মোকাদ্দাসের রাজপথে ঢল নামলো রক্তের। রক্তরঞ্জিত পথে চলছিল মরণপণ লড়াই।

ইতিমধ্যে এক মুসলিম মুজাহিদ বড় গেটের উপরে গম্বুজের মাথায় ক্রুসেডদের যে পতাকা ছিল তা নামিয়ে আনলো। সেখানে উড়িয়ে দিল ইসলামী পতাকা।

যুদ্ধ এখন আর কেবল সৈন্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। হাতাহাতি লড়াই চলছিল শহরের সর্বত্র। শহরের নিয়ন্ত্রণ তখন কারো হাতেই নেই। খৃস্টান নাইট ও সৈন্যরা শহরময় ছুটাছুটি করছিল। মুসলিম মুজাহিদরাও ছুটছিল সমান তালে। যে

যেখানে যাকে যেভাবে পারছে, মারছে।

অন্য সময় এ রকম ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়লে ক্রুসেড বাহিনীর সৈন্যরা তো বটেই, অনেক সেনাপতি এবং নাইটরাও পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতো। কিন্তু আজ কারো মনেই পালাবার কোন চিন্তা এলো না। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার একটাই উপায়, প্রতিপক্ষকে নিধন করা। সবাই তোড়েজোড়ে সে কাজটিই করছিল।

সুলতান আইয়ুবীর জানবাজ বাহিনীর সামনেও তখন একটাই কাজ, প্রতিপক্ষের প্রতিটি সৈন্যকে হত্যা করে বিজয় ছিনিয়ে নেয়া। তারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেও সেই কাজটিই করছিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল মুসলমান নারী পুরুষ সবাই। তারাও বাঁচার পথ পরিষ্কার করছিল খৃস্টানদের হত্যা করে। ফলে যুদ্ধ কেবল সৈনিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। খৃস্টান ও মুসলমান উভয় দলের সৈন্য ও জনগণ এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। মুহূর্তে যুদ্ধটি সর্বাত্মক যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করলো। একদল মুসলিম সৈন্য মসজিদুল আকসার উপর থেকে ক্রুশ চিহ্নটি সরিয়ে ফেলে সেখানে ইসলামী পতাকা উড়িয়ে দিল।

তখনও শহরের অলিতে গলিতে দু'পক্ষের মধ্যে চলছে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। কিন্তু যতই সময় যেতে লাগলো ক্রুসেড বাহিনীর ক্ষিপ্রতা ততোই শিথিল হয়ে আসতে লাগলো।

সুলতানা আইয়ুবী তখনও খৃস্টানদের শান্তি মিশনের সাথে আপোষ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাইরে ও শহরের মধ্যে

কি ঘটছে সে খবর তারা কিছুই জানতেন না।
তিনি বালিয়ানকে বললেন, 'আমি বায়তুল মোকাদ্দাস শক্তি দিয়ে মুক্ত করার শপথ নিয়েছি। যদি আপনারা শহরটি এ শর্তে ছেড়ে দেন যে, আমি শহর জয় করেছি, তবেই আপোষের আলোচনা চলতে পারে।'
'সালাহউদ্দিন!' বালিয়ান একটু গম্ভীর স্বরেই বললেন, 'এই শহরের নাম এখনও জেরুজালেমই আছে, বায়তুল মোকাদ্দাস হয়নি। যদি আপোষ করতে না চান তবে আপনাকে বাধ্য করবো না।
কিন্তু এ কথা শুনে নিন, আপনার চার হাজার সৈন্য এখনো ক্রুসেড বাহিনী কাছে যুদ্ধবন্দী অবস্থায় আছে। আর যেসব মুসলমান এ শহরে বন্দী অবস্থায় বাস করছে তাদের সংখ্যাও তিন হাজার। আমরা এসব বন্দী ও শহরের প্রতিটি মুসলমান নাগরিককে– হোক সে নারী, হোক শিশু, হোক বৃদ্ধ বা যুবক, সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবো আপনার আক্রমণের।'
সুলতান আইয়ুবীর চোখ রাগে রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এ সময় তাবুর পর্দা ঠেলে এক কমান্ডার প্রবেশ করলো।
কমান্ডার ইশারায় সুলতানকে কাছে ডেকে তাঁর কানে কানে বললো, 'শহর দখল হয়ে গেছে। প্রধান ফটক ও মসজিদুল আকসার উপর ইসলামী পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'
সুলতান আইয়ুবী বালিয়ানের ধমকের উত্তর পেয়ে গেছেন।

তাঁর রক্তলাল চোখে তখন অসাধারণ এক চমক দেখা গেল। তিনি জোরে হাতের তালুতে হাত মেরে খৃস্টান সরদার বালিয়ানকে বললেন, 'বিজয়ী কখনও বিজিতদের সাথে শর্ত মেনে আপোষ চুক্তি করে না। এখন একটি মুসলমানও তোমাদের কয়েদী নেই।'

সুলতান আইয়ুবী যদিও ধৈর্যের সাথে কথা বলছিলেন, কিন্তু বালিয়ানের ধমকের চাইতেও তাঁর কণ্ঠ ছিল বলিষ্ঠ ও ভরাট। তিনি রূঢ়ভাবেই বললেন, 'এখন তোমরাই আমার কয়েদী। তোমাদের সমস্ত সৈন্যই আমাদের যুদ্ধবন্দী। শহরে বসবাসকারী খৃস্টানরা আমাদের কাছে বন্দী। এখন শহরের সে সব খৃষ্টান বেরিয়ে যেতে পারবে যারা আমার নির্ধারিত অর্থ জরিমানা দিতে পারবে। এখন যাও, দেখো এ শহর জেরুজালেম নাকি বায়তুল মোকাদ্দাস।'

সরদার বালিয়ান ও তার সাথীরা ভয় পেয়ে গেল। তাবু থেকে বেরিয়ে তারা দেখলো, সুলতান আইয়ুবীর অধিকাংশ সৈন্য শহরে প্রবেশ করেছে এবং শহরের প্রধান গেটে ইসলামী পতাকা উড়ছে।

এটা একটা আকস্মিক ঘটনা নাকি সুলতান আইয়ুবীর প্ল্যানই এমন ছিল অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এমনই ছিল ইচ্ছা বুঝতে পারলো না বালিয়ান।

সুলতান আইয়ুবী জুম্মার দিন ৬ অক্টোবর মুতাবেক ৬ই রজব ৫৮৩ হিজরী সনে শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন। এই রজব মাসের ২৭ তারিখ রাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে মেরাজে গিয়েছিলেন। আল্লাহর এ এক অপার মহিমা যে সেই রজব মাসেই তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিলেন মুসলমানদের।

সুলতান আইয়ুবী যখন শহরে প্রবেশ করলেন তখন মুসলমানরা সবাই ঘর থেকে রাস্তায় নেমে এসেছিল। মেয়েরা খুশীতে তাদের মাথার চাদর ও ওড়না রাস্তায় বিছিয়ে দিতে লাগলো তার সম্মানে। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী সেগুলো রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে বললেন। কারণ তিনি মানুষ পুজা ও তোষামোদকে খুব ঘৃণা করতেন।

সুলতানের রক্ষী বাহিনী রাস্তা থেকে মেয়েদের ওড়নাগুলো উঠিয়ে দিল আর ওদের বললো, 'আল্লাহর প্রশংসা করো। এ বিজয় তার দান। সুলতান এবং আমরা নিমিত্ত মাত্র।' তখন ওরাও মুক্তির আনন্দে পুরুষের মত উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি দিতে লাগলো। কেউ কেউ রাস্তার ওপরই সিজদায় পড়ে আল্লাহর শোকর আদায় করলো।

সুলতান শহরে পা দিতেই সেখানে এক অভাবিত দৃশ্যের অবতারণা হলো। আনন্দ বেদনার বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে গেল তাদের হৃদয়গুলো। সবার চোখে উছলে উঠলো আনন্দের অশ্রুধারা। সকৃতজ্ঞ নয়নে সবাই ছুটে এলো কিংবদন্তীর নায়ক তাদের এ মহান মুক্তিদূতকে এক নজর দেখার জন্য।

সেখানে সৃষ্টি হলো এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের! সুলতান আইয়ুবী নিজেও এতবেশী আবেগময় হয়ে উঠলেন যে, তিনিও সবার

সাথে তাকবীর ধ্বনি দিতে লাগলেন।
শ্লোগানের তালে তালে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছিল জনতার মুষ্ঠিবদ্ধ হাতগুলো। তাতে প্রকাশ পাচ্ছিল তাদের সংকল্প ও দৃঢ়তার বলিষ্ঠতা।
সুলতান আইয়ুবী হাত নেড়ে জবাব দিচ্ছিলেন জনতার এ স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের। কিন্তু তার মুখে কোন হাসি ও আনন্দের আভা ছিল না, বরং তিনি ঠোঁট কামড়ে সংযত করার চেষ্টা করছিলেন নিজের আবেগ।
আবেগের উচ্ছ্বাসে তাঁর বার বার কান্না পাচ্ছিল। এ কান্না কৃতজ্ঞতার কান্না। যে মহান সত্ত্বা এই অভাবিত বিজয় দান করলেন তাঁর জন্য বার বার কৃতজ্ঞতায় তার মাথা নুয়ে আসছিল। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন নিজেকে সম্বরণ করতে। কিন্তু কান্না এসে বার বার তার আবেগে ঝড় তুলছিল।
খৃস্টানরা দুয়ার এঁটে তাদের ঘরে বসে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। তারা তাদের যুবতী মেয়েদের লুকিয়ে রাখলো। মেয়েদেরকে পুরুষের লেবাস পরিয়ে দিল। তাদের ধারনা ছিল, মুসলিম বাহিনী যখন প্রতিশোধ নেয়া শুরু করবে তখন তারা কেউ রেহাই পাবে না। তারা মেয়েদের উপর অত্যাচার করবে। পুরুষদের হত্যা করবে।
কিন্তু ইউরোপের লেখক লেনপোল লিখেছেন, 'সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সেখানে যে উদার মনোভাব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন তা সত্যি অভাবিত। এমন দৃশ্য ওখানকার কেউ আগে কখনোই দেখেনি। যখন তার সৈন্যদল ক্রুসেড বাহিনীর

কবল থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত করে, তখন তিনি তার বাহিনীর কমান্ডার ও সেনাপতিদের শহরে শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করতে কঠোর নির্দেশ দেন।

শহরে যেন কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার না হয় সে জন্য সৈন্যদের টহল দিতে আদেশ দেন তিনি। শহরের অধিবাসী মুসলমান, যারা এতদিন খৃস্টানদের দ্বারা নির্যাতীত হয়েছিল তাদের কেউ যেন খৃস্টানদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আক্রমণ চালাতে না পারে তিনি সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতেও হুকুম জারী করেন।'

সুলতান আইয়ুবীর সমস্ত আদেশ ছিল ইনসাফ ও করুণা ভিত্তিক। কোন খৃষ্টানকেই তিনি শহর থেকে বিতাড়িত করেননি। কারো ওপর যেন কোন জুলুম অত্যাচার না হয় তা নিশ্চিত করে তিনি মসজিদুল আকসার দিকে এগিয়ে গেলেন। তার পা যতই মসজিদুল আকসার দিকে যাচ্ছিল ততোই তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠছিলেন।

মসজিদের দৃশ্য যখন তার চোখে দৃষ্টিগোচর হলো তিনি আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। তখন তার শরীর আবেগে থরথর করে কাঁপছিল। সুলতান আইয়ুবী মসজিদুল আকসায় পৌঁছেই আবেগের আতিশয্যে মসজিদের বারান্দায় বসে পড়লেন এবং সেখানেই সিজদায় পড়ে গেলেন।

সুলতান আইয়ুবীর চোখ দিয়ে তখন অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। যেন তিনি এ মসজিদের বারান্দা চোখের পানিতে ধুয়ে দিচ্ছেন।

মসজিদের অবস্থা ছিল তখন খুবই শোচনীয়। অতীতে মুসলিম শাসকরা যুগে যুগে মসজিদকে সোনার ঝাড়বাতি ও রৌপ্যের আগরবাতি এবং মূল্যবান উপহার ও উপঢৌকন দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন। সে সব জিনিস খৃস্টানরা সবই লুট করে নিয়ে গেছে।

মর্মর পাথরের মেঝেও জায়গায় জায়গায় ভেঙ্গে গেছে। দেয়ালের পলেস্তরা খসে গেছে। এসব দেখে বেদনায় তার অন্তর ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তিনি মসজিদটি পুনঃ মেরামতের সিদ্ধান্ত নিলেন। মসজিদ পুনঃনির্মাণের আগে সুলতান আইয়ুবী শহরের প্রশাসনিক কাজের দিকে মনযোগ দিলেন।

খৃস্টানরা ছিল ভাত, শংকিত ও চিন্তাগ্রস্ত। তাদের ভাগ্যে কি আছে এই দুশ্চিন্তায় তাদের ঘুম হচ্ছিল না। তাদের মনে হচ্ছিল তারা এক অদৃশ্য জিন্দানখানায় বন্দী হয়ে পড়েছে।

সুলতান আইয়ুবী প্রথমেই এই পরাজিত খৃষ্টানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে চাইলেন। তিনি খৃস্টানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তার উপদেষ্টাদের জরুরী সভা আহবান করলেন। পরামর্শ সভার সিদ্ধান্তক্রমে তিনি আদেশ জারি করলেন, 'প্রত্যেক খৃস্টান পুরুষ দশ দিনার, মেয়েরা পাঁচ দিনার এবং শিশুরা এক দিনার মুক্তিপণ দিয়ে শহর থেকে বের হয়ে যেতে পারবে।'

এ ঘোষণা খৃস্টানদের দুশ্চিন্তামুক্ত করলো। তারা মানসিক বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলো। যারা সেখানে থাকতে চাইলো না

তারা মুক্তিপণ দিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

শহরের প্রধান ফটকে দাউদ গম্বুজের নিচে মুসলিম অফিসার বসলো মুক্তিপণ আদায় করতে। এখানে এসে মুক্তিপণ দিয়ে খৃস্টান বাসিন্দারা শহর ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করলো।

প্রথমেই মুক্তিপণ দিয়ে শহর থেকে বের হলো খৃষ্টান সরদার বালিয়ান। তার কাছে ছিল ইংল্যান্ডের সম্রাট হেনরীর পাঠানো অনেক অর্থ। তিনি সেই অর্থ থেকে ত্রিশ হাজার দিনার ব্যয় করলেন শহরের খৃস্টানদের মুক্ত করার কাজে। ফলে শুরুতেই দশ হাজার খৃস্টান মুক্ত হয়ে গেল এই অর্থের বিনিময়ে।

দাউদ গম্বুজের প্রধান ফটকে বিদায়ী খৃস্টানদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার বিরাট লাইন লেগে গেল। তারা প্রত্যেকে আপন বংশ ও পরিবারের মুক্তিপণ দিয়ে দলে দলে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

চিরকালই এটা যুদ্ধের নিয়ম যে, বিজয়ী সৈন্যরা বিজয়ের পর সেই শহরে লুটতরাজ করে। বায়তুল মোকাদ্দাস ছিল এমন শহর যেখানকার অধিবাসীরা এর আগেও লুটতরাজের সম্মুখীন হয়েছিল। ক্রুসেড বাহিনী ও খৃস্টানরা বিজয় লাভের পর পাইকারীহারে মুসলমান নিধন করেছিল এ শহরে। তারা মুসলমানদের অর্থ সম্পদ সবই লুট করে নিয়েছিল। তাদের স্ত্রী কন্যাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছিল। মসজিদ অপবিত্র করেছিল। খৃস্টানরা ধারনা করেছিল, এবার তাদের ভাগ্যে জুটবে সেই দুর্গতি ও লাঞ্ছনা।

কিন্তু মুসলমানরা যখন শহর অধিকার করলো তখন ঘটলো এর

বিপরীত ঘটনা। তারা লুটপাট বা অন্যায় অত্যাচার তো করলোই না বরং খৃস্টানদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানের জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করলো।

সুলতান আইয়ুবী মুসলমান ব্যবসায়ীদেরকে বললেন, 'তোমরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে খৃষ্টানদের মালপত্র ক্রয় করবে যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং মুক্তিপণ আদায় করে শহর থেকে বের হতে পারে।'

এভাবে যেসব খৃস্টানদের কাছে নগদ অর্থ ছিল না তারাও মালপত্র বিক্রি করে মুক্ত হয়ে গেল। মুক্তিপণের বাইরে খৃস্টানদের কোন সম্পদেই হাত দেয়ার কোন অধিকার ছিল না মুসলমানদের জন্য।

এ সময়ের একটি ঘটনা পরবর্তী কালে জানাজানি হয়ে গেলে বিশ্বব্যাপী ধিক্কার ও নিন্দা কুড়িয়েছে। ঘটনাটি ছিল এরকম: বায়তুল মুকাদ্দেসের সবচেয়ে বড় পাদ্রী বোত্রিক হারকিউলিস এক কান্ড করে বসলেন। তিনি গির্জায় গচ্ছিত সমস্ত সোনা দানা ও অর্থ সম্পদ তার নিজস্ব ফান্ডে জমা করে নিলেন।

ঐতিহাসিকরা বলেছেন, এসব অর্থ এত বিপুল পরিমাণ ছিল যে এগুলো মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে তিনি অবশিষ্ট খৃস্টানদের সহজেই মুক্ত করে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি শুধু তার মুক্তিপণ দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান।

যে অফিসার মুক্তিপণ আদায় করছিলেন তিনি দেখলেন বহু অর্থ সম্পদ সাথে নিয়ে পাদ্রী সাহেব চলে যাচ্ছেন। তিনি খবরটি সুলতান আইয়ুবীকে জানিয়ে জানতে চাইলেন, এত বিপুল

পরিমাণ সোনাদানা ও মুল্যবান সম্পদ নিয়ে তিনি তাকে যেতে দেবেন কিনা?

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'যদি সে তার মুক্তিপণ দিয়ে থাকে তবে তাকে আর বাঁধা দিও না। আমি তো বলেই দিয়েছি, যে যতটুকু সঙ্গে নিতে পারে তা সে নিয়ে যেতে পারবে। এই সম্পদ তার নাকি গীর্জার সেটা দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। আমি আমার কথার বিরুদ্ধে যেতে পারবো না।'

পাদ্রী মহাশয় গীর্জা থেকে চুরি করা সমুদয় অর্থ সম্পদ ও দামী পণ্যসামগ্রী নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুলতান আইয়ুবী মুক্তিপণ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য খৃস্টানদের চল্লিশ দিন সময় ধার্য করে দিয়েছিলেন। চল্লিশ দিন শেষ হয়ে গেল। দেখা গেল তখনও কয়েক হাজার গরীব খৃষ্টান শহরে রয়ে গেছে।

নব্বই বছর আগে যখন খৃস্টানরা শহরটি দখল করেছিল তখন দেশ বিদেশ থেকে বহু খৃস্টান এই শহের এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা কোনদিন আশা করেনি, আবার তাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। চল্লিশ দিন শেষ হয়ে যাওয়ার পর সুলতান আইয়ুবী এই গরীব খৃস্টানদের কি করবেন ভাবছিলেন। তখন তাঁর ভাই সুলতান তকিউদ্দিন সুলতান আইয়ুবীর কাছে এক আবেদন নিয়ে হাজির হলেন।

'সম্মানিত সুলতান।' তকিউদ্দিন বললেন, 'আপনি জানেন এই শহর জয় করতে আমি ও আমার বাহিনী কেমন ত্যাগ স্বীকার

করেছি। তার বিনিময়ে আমাকে এক হাজার খৃষ্টান দাস হিসেবে দান করুন।'

'এত দাস দিয়ে তুমি কি করবে?' সুলতান আইয়ুবী জিজ্ঞেস করলেন।

'সেটা আমার ব্যাপার! আমি মনে মনে কোন পরিকল্পনা স্থির করেই আপনার কাছে এ আবেদন করেছি।'

সুলতান আইয়ুবী তাকে এক হাজার খৃষ্টান দাস হিসাবে দেয়ার আদেশ দান করলেন। তকিউদ্দিন এক হাজার খৃস্টানকে বেছে নিলেন। তিনি তাদের নিয়ে দাউদ গেটে গেলেন এবং সবাইকে মুক্ত করে দিয়ে ফিরে এলেন।

'সম্মানিত সুলতান।' তকিউদ্দিন ফিরে এসে সুলতানকে বললেন, 'আমি তাদের সকলকে মুক্ত করে গেটের বাইরে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। তাদের কাছে মুক্তিপণের কোন অর্থ ছিল না।'

'আমি জানতাম তুমি তাই করবে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'নতুবা তোমার হাতে একজন খৃস্টানকেও দাস হিসেবে দিতাম না। মানুষ মানুষের দাস হতে পারে না, আল্লাহ তোমার এ পূণ্য কাজ গ্রহণ করুন।'

এ ঘটনা কোন গল্প কথা নয়। এমন আরো অনেক ঘটনা ঐতিহাসিকরা তাদের বইতে বর্ণনা করেছেন।

এ রকম আরেকটি ঘটনা: খৃস্টান মেয়েদের একটি দল সুলতান আইয়ুবীর কাছে গেল। এরা সকলেই সেই সব ক্রুসেড সৈন্যদের স্ত্রী, মা, বোন ও কন্যা ছিল যারা এই যুদ্ধে নিহত

হয়েছিল বা যুদ্ধবন্দী হিসাবে সুলতানের কাছে বন্দী ছিল। তাদের কাছে মুক্তিপণের কোন টাকা ছিল না।
তারা সুলতানের কাছে তাদের দুঃখের কথা তুলে ধরলো। সুলতান আইয়ুবী তাদের বললেন, 'তোমাদের মুক্তিপণের টাকা দিতে হবে না। আমি দাউদ গেটে বলে দিচ্ছি, তোমাদেরকে যেনো মুক্তিপণ ছাড়াই বাইরে যেতে দেয়া হয় এবং আরো বলে দিচ্ছি, তোমাদের প্রত্যেককেই যেনো কিছু অর্থ সাহায্য হিসাবে দেয়া হয়।' তারা ফটকে পৌঁছলে সেখানকার অফিসার তাদের নাম ধরে ডাকলো এবং প্রত্যেকের হাতে কিছু নগদ অর্থ দিয়ে তাদের বিদায় করলো।
এরপর তিনি ঘোষণা দিলেন, 'যে সব খৃস্টান এখনও শহরে রয়ে গেছে তাদের কোন মুক্তিপণ লাগবে না। তাদের মুক্তিপণ মাফ করে দেয়া হলো। তারা বিনা বাঁধায় নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যেতে পারবে। যুদ্ধবন্দী হিসাবে থাকবে শুধু সৈন্যরা, যারা যুদ্ধের সময় আত্মসমর্পন করেছিল।'
এরপর সুলতান আইয়ুবী মনোনিবেশ করলেন মসজিদুল আকসার মেরামত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে। এই কাজে তিনি নিজেও সৈন্যদের সাথে মিলেমিশে সাধারণ শ্রমিকের মতই চুনসুড়কি ও ইট বহনের কাজ করেছেন।
১১৮৭ সালের ১৯ অক্টোবর। সেদিনটি ছিল জুম্মা বার। সুলতান আইয়ুবী জুম্মার নামাজের জন্য মসজিদে গেলেন। তিনি সেই মিম্বারটি, যেটি মরহুম সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গী তৈরী করে রেখেছিলেন এবং তাঁর বিধবা স্ত্রী ও কন্যা বহন করে এনে

সুলতানকে দিয়েছিলেন সেটি তিনি নিজ হাতে মসজিদুল আকসায় স্থাপন করলেন। সেদিন জুম্মার খোৎবা দান করেছিলেন দামেশকের খতিব।

এরপর সুলতান আইয়ুবী মসজিদের সাজসজ্জার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। মর্মর পাথর এনে মসজিদের মেঝেতে সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিলেন এবং মসজিদটিকে এক মনোমুগ্ধকর ভবনে রূপান্তরিত করলেন।

যে সব মূল্যবান ও সুন্দর পাথর সুলতান আইয়ুবী নিজ হাতেই ওখানে স্থাপন করেন আজও সেই পাথরগুলো সেখানেই আছে এবং তার সৌন্দর্য আজও ম্লান হয়নি।

বায়তুল মোকাদ্দাসের বিজয় ইসলামের ইতিহাসে এক বিরাট সফলতার মাইলফলক। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে সুলতান আইয়ুবীর সংগ্রাম ও সাধনা শেষ হলেও তিনি যে ক্রুসেডের মোকাবেলা করেছিলেন সেই ক্রুসেড এখনও শেষ হয়নি। আজো পৃথিবীর দেশে দেশে চলছে ঘোষিত ও অঘোষিত ক্রুসেড।

তিনি আরবভূমি ও ফিলিস্তিনকে ক্রুসেড বাহিনীর রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার অবর্তমানে ফিলিস্তিন, ইরাক এবং আরবের বিভিন্ন দেশে চলছে ক্রুসেড বাহিনীর নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ।

শুধু আরব দেশই নয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মুসলমানদের জানমালও আজ নিরাপত্তাহীন। মুসলিম

রাষ্ট্রগুলোর ঘাড়ে আজো চেপে আছে বেহায়া সাম্রাজ্যবাদের সিন্দাবাদী দৈত্য।

তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসকে এক মজবুত কেল্লা ও মুজাহিদদের সুদৃঢ় ঘাঁটি বানাতে চেয়েছিলেন। এ জন্য এই পবিত্র স্থানে তিনি গড়ে-তুলেছিলেন এক সমৃদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র। কিন্তু আজ সেখানে আবার আসন গেড়ে বসেছে নাসারাদের দোসর ও উপদেষ্টা অভিশপ্ত ইহুদীরা।

৫ রমজান ৫৮৩ হিজরী মুতাবেক ৮ নভেম্বর ১১৮৭ খৃস্টাব্দ। সুলতান আইয়ুবী বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে স্বসৈন্যে যাত্রা করলেন। তাঁর গতি ছিল উত্তরের দিকে।

বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বেরিয়েই তিনি তাঁর সন্তান আল মালেক আল জাহেরকে সংবাদ পাঠালেন খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর কাছে চলে আসে। সুলতান তাকে আরো জানালেন, 'আমি টায়ারে যাচ্ছি। পথে দেখা না হলে তুমি সেনাবাহিনীসহ টায়ারে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করবে।'

সুলতান তখন টায়ারে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন। টায়ার ভূমধ্যসাগর তীরের এক সমৃদ্ধ সমুদ্র বন্দর। বন্দরটি ছিল খৃস্টানদের মজবুত ঘাঁটি। এখানে তাদের একাধিক রণতরীও ছিল।

সুলতান আইয়ুবী তাঁর নৌবাহিনীর কমান্ডার এ্যাডমিরাল আল ফারেসকে সংবাদ পাঠালেন, সে যেন টায়ার বন্দরের কাছাকাছি

অবস্থান নেয়। তিনি যখন টায়ারে আক্রমণ ও অবরোধ করবেন, তখন যেন আল ফারেস টায়ারের বন্দরে অবস্থানরত খৃস্টান নৌবহরের উপর আক্রমণ করে।

দুটি মেয়েই তখনো আল ফারেসের জাহাজে ছিল। হাসান বিন আবদুল্লাহর গোয়েন্দা তখন সেখানে ছিল না।

বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয়ের পর হাসান বিন আবদুল্লাহ আবার তার গোয়েন্দা বিভাগের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তখন তাঁর মনে পড়ে গেলো, আল ফারেসের জাহাজে তাঁর এক গোয়েন্দা রয়েছে। তিনি আবার এক কাসেদকে রউফ কুর্দীর কাছে পাঠালেন।

কাসেদকে বললেন, 'ওখানে আমাদের যে গোয়েন্দা আছে এখনো সে কি করছে দেখে এসো। রউফ কুর্দীকে বলবে, প্রয়োজন না থাকলে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে।'

সে লোক হুকুম পেয়ে জাহাজে পৌঁছলো। রউফ কুর্দীর কাছে জানতে চাইলো গোয়েন্দার খবর। রউফ কুর্দী তাকে জানালো, 'হাসান বিন আবদুল্লাহ যে গোয়েন্দাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন সে তো অনেকদিন আগেই চলে গেছে।'

কিছুদিন আগের কথা। সেই গোয়েন্দা রউফ কুর্দীকে একদিন জানালো, সে মেয়ে দুটিকে আর এখানে থাকতে দেবে না। কারণ সে এখন নিশ্চিত, এরা খৃস্টানদের গোয়েন্দা।

তার এমন ধারনার কারণ, সে লক্ষ্য করেছে, যখন জাহাজ কূলের দিকে নোঙ্গর করা থাকে তখন জেলের বেশে ছোট

ছোট নৌকায় করে কিছু লোক সেখানে আসে ফলমুল ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করতে।

তাদের মধ্যে এক লোককে সে তিন চার জায়গায় দেখতে পেলো। মেয়ে দুটি প্রতিবারই তাকে রশির মই নামিয়ে উপরে তুলে নেয়। কিন্তু তার কাছ থেকে কোন জিনিস কেনার পরিবর্তে তার সাথে কি যেন পরামর্শ করে।

জাহাজ দশ বারো মাইল দূরে থাকলেও লোকটি ঝুঁকি নিয়ে সেখানে যায়। ফলে লোকটাকে গোয়েন্দার সন্দেহ হলো।

ফ্লোরী ততোদিনে রউফ কুর্দীর বুদ্ধি বিবেক পুরোপুরিই কিনে নিয়েছিল। সে তার কাছে নানা রকম গোপন তথ্য জানতে চাইতো। রউফ কুর্দী তাকে আপন মনে করে সব কিছু বলে দিত নির্ভয়ে।

আল ফারেস তখন খুব ব্যস্ত। তিনি নিয়মিত অন্য জাহাজে চলে যান তাদের খোঁজ খবর নিতে। সেদিন রাতেও তিনি তার দায়িত্ব পালনের জন্য অন্য এক জাহাজে চলে গিয়েছিলেন।

সেই রাতে রউফ কুর্দী যখন ফ্লোরীর প্রেমে মত্ত তখন সে ফ্লোরীকে বললো, 'জাহাজে এক বিপজ্জনক লোক আছে। তার সাথে কোন কথা বলবে না।'

ফ্লোরী জানতে চাইল, 'কে সেই বিপদজনক লোক?'

রউফ কুর্দী তার পরিচয় দিয়ে বললো, 'এ লোক আমাদের গোয়েন্দা। তাই তার কাছ থেকে সাবধান থাকবে।'

রউফ কুর্দী তখনো মেয়ে দুটিকে যাযাবরের কন্যা মনে করতো। তাই সে গোয়েন্দা লোকটির পরিচয় তার কাছে ফাঁস

করে দিল।

ফ্লোরী ছিল ঝানু গোয়েন্দা। সে বুঝে নিল, রউফ কুর্দী যার কথা বলছে, তাকে সে সহ্য করতে পারছে না। লোকটি যদি গোয়েন্দা হয় তাহলে সে তাদেরকে জাহাজে থাকতে দেবে না। আর রউফ কুর্দীও চাইবে না মেয়েরা জাহাজ থেকে বিদায় হয়ে যাক। হয়তো এটাই তাদের দ্বন্দ্বের মূল কারণ।

পরের রাতের ঘটনা। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর আল ফারেস ডিউটি তদারক করার জন্য অন্য জাহাজে চলে গেলেন। রউফ কুর্দী তখন জাহাজের দায়িত্বে।

মাঝরাতের একটু পর। রউফ কুর্দী ও ফ্লোরী জাহাজের ছাদের এক কোণায় গোপন অভিসারে মেতে ছিল। ওখানে জড়ো করে রাখা হয়েছিল বিভিন্ন জিনিসপত্র। ওগুলোর আড়ালে বসেছিল ওরা।

হাসান বিন আবদুল্লাহর গোয়েন্দা ছাদে উঠেছিল ঘুরে দেখতে। ছাদে উঠেই তার মনে হলো জঞ্জালের আড়ালে কারা যেন ফিসফাস কথা বলছে। সে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল এবং হঠাৎ করেই উদয় হলো তাদের সামনে।

রউফ কুর্দী ভয় পেলেও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলো, 'আরে, এত রাতে তুমি এখানে?'

তারপর তার হাত ধরে তাকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে বললো, 'ভালই হয়েছে তুমি এসেছো। তুমি বলেছিলে, এরা গোয়েন্দা হতে পারে। তাই মেয়েটাকে লোভ লালসা দেখিয়ে জানতে চাচ্ছিলাম ওদের আসল পরিচয়। কিন্তু না, তেমন কিছুই উদ্ধার

করতে পারলাম না।'

সে গোয়েন্দাকে বললো, 'তুমি যখন এসেছো এবার আমি চলে যাই। তুমি চেষ্টা করে দেখো কৌশলে কিছু জানতে পারো কি না? তুমি তো অভিজ্ঞ গোয়েন্দা, তোমার জেরার মুখে পড়লে হয়তো গোপন কোন তথ্য বেরিয়েও আসতে পারে।'

সে গোয়েন্দাকে ফ্লোরীর কাছে পাঠিয়ে দ্রুত রোজীর কাছে চলে গেল। তাকে বললো, 'আরেকটু হলে ফেঁসে গিয়েছিলাম।'

'কেন? কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো রোজী।

কি ঘটেছে সে সব খুলে বললো রোজীকে। রোজী বললো, 'ভালই শিকার জোগাড় করেছো। তুমিও মরবে, আমাদেরও মারবে।'

'রোজী, তুমি ওখানে যাও। ওকে বুঝানোর চেষ্টা করো আমি তোমাদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করার চেষ্টা করছিলাম। সে যদি টের পায় তোমাদের সাথে আমার কোন রকম সম্পর্ক আছে তবে আমার প্রেম করার শখ মিটিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে, তুমি এদিকে পাহারা দাও কেউ যেন উপরে যেতে না পারে। আমি যাচ্ছি ছাদে।'

রোজী উপরে চলে গেল। রউফ কুর্দী এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে পাহারা দিতে লাগলো যেন কেউ উপরে যেতে না পারে।

রোজী যাওয়ার আগে একটুকরো শক্ত রশি নিল সাথে। তারপর সেই রশি ওড়নায় ঢেকে চলে গেল যেখানে গোয়েন্দাটি ফ্লোরীর কাছে বসেছিল সেখানে। জঞ্জালের আড়াল থাকায় জায়গাটা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। রোজীও তাদের পাশে বসে গেল।

গোয়েন্দা গল্প গুজবের মাধ্যমে তাদের আসল পরিচয় জেনে নিতে চেষ্টা করছিল। রোজী হঠাৎ গোয়েন্দার গলায় রশি পেঁচিয়ে শক্ত করে টেনে ধরলো।

ফ্লোরীও ফাঁসের অপর প্রান্ত টেনে ধরলো শক্ত করে। তারা উভয়েই ছিল ট্রেনিংপ্রাপ্ত সাহসী গোয়েন্দা। সেই ট্রেনিং এবার কাজে লাগাচ্ছে তারা।

হাসান বিন আবদুল্লাহর গোয়েন্দা নিজেকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালালো। কিন্তু দু'জনের দু'দিক থেকে রশি টানাটানির ফলে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। দেহ শিথিল হয়ে গেল এবং এক সময় সে ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে।

মেয়ে দুটি গোয়েন্দার লাশটি ধরাধরি করে নিয়ে গেল জাহাজের কিনারে। তারপর তা গড়িয়ে ফেলে দিল গভীর সমুদ্রে। এভাবেই সুলতান আইয়ুবীর এক গোয়েন্দার সলিল সমাধি ঘটলো সবার অজান্তে। সে হয়ে গেল ভূমধ্যসাগরের সামান্য মাছের খোরাক।

লাশটা পানিতে ফেলেই রোজী নিজের ক্যাবিনের দিকে হাঁটা ধরলো। ফ্লোরী দাঁড়িয়ে রইলো সেখানেই।

রউফ কুর্দী রোজীকে দেখেই তার কাছে এগিয়ে এলো। বললো, 'খবর কি?'

'প্রেম করতে হলে মাথায় কিছু বুদ্ধিও রাখতে হয়। যাও, এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিলাম। তোমার প্রতিপক্ষ এতোক্ষণে নিশ্চয়ই মাছের পেটে চলে গেছে।' ক্যাবিনের দিকে হাঁটতে হাঁটতেই

বললো রোজী।
রউফ কুর্দী দ্রুত উঠে এলো ছাদে। দেখলো রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ফ্লোরী। তাকিয়ে আছে সমুদ্রের অনন্ত ঢেউরাশির দিকে। আলতো পায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রউফ কুর্দী। বললো, 'কি দেখছো?'
ফ্লোরী ঘুরে দাঁড়ালো। আচমকা জড়িয়ে ধরলো তাকে। তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কান্নাকাতর কণ্ঠে বললো, 'তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে শেষে লোকটাকে মেরেই ফেললাম!' যেন অনুশোচনায় মরে যাচ্ছে সে।
রউফ কুর্দীও তাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এসবই নিয়তির খেলা। নইলে এতো রাতে মরার জন্য সে ছাদে উঠে এসেছিল কেন? মন খারাপ করো না। যা হবার হয়ে গেছে, এখন সব ভুলে যাও।'

আল ফারেস যেমন জানতো না, তার জাহাজে কোন গোয়েন্দা আছে আর রউফ কুর্দী তাকে কোন কাজে লাগিয়ে দিয়েছে তেমনি তার করুণ পরিণতির কথাও সে জানতে পারেনি।
জাহাজীদের জীবন আগে যেমন ছিল তেমনি চলছিল। গোয়েন্দার আগমন যেমন কোন আলোড়ন তুলতে পারেনি জাহাজে তেমনি তার অস্তিত্বও নিঃশব্দে মুছে গেল দুই খৃস্টান মেয়ের হিংস্রতার কবলে পড়ে।
গোয়েন্দা নিহত হওয়ার দুই দিন পর। আল ফারেস তার ক্যাবিনে বসে চিন্তা করছিল। নিজের ও আরও পাঁচটি জাহাজের

মাল্লা ও নৌসেনারা মাসের পর মাস সমুদ্রে কাটিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্রের একঘেয়েমি পেয়ে বসেছে সবাইকে। সবাই কেমন নির্জীব ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ডাঙার স্বাভাবিক আলো বাতাস থেকে দূরে মাটির স্পর্শহীন মানুষগুলোর জীবন ক্রমেই তিক্ত ও বিরক্তিকর হয়ে উঠছে।

যদি ওরা সংঘাত ও যুদ্ধে জড়িয়ে থাকতো তবে তাদের মানসিক অবস্থা এমন হতো না। সে জন্য আল ফারেস ভাবলো, সৈনিক ও মাল্লাদের উজ্জীবিত করার জন্য কোন আনন্দ অনুষ্ঠান করা উচিত। বিষয়টি নিয়ে সে রউফ কুর্দীর সাথে পরামর্শ করলো। রউফ কুর্দী তাকে বললো, 'রাতে সবকটা জাহাজকে একত্রিত করে মাল্লা ও নৌসেনাদের নিয়ে ভোজ সভার আয়োজন করা যেতে পারে।'

এ আনন্দদায়ক সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সময় নিল না। জাহাজের মাল্লা ও সৈনিকদের কানে পৌঁছে গেল এ খবর। মেয়েদের কানেও গেল। মেয়ে দু'জন বললো, 'আমরা ভোজসভায় নাচবো ও গান করবো।'

আল ফারেস স্ফূর্তিবাজ লোক, এ প্রস্তাবে তিনিও তাল দিলেন। কিন্তু কোন রাতে এ অনুষ্ঠান করা হবে এখনও তা নির্ধারণ করেননি। তিনি সুলতান আইয়ুবীর কাসেদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সুলতানের কাছ থেকে কোন শুভ সংবাদ এলে সেই উপলক্ষেই এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। আল ফারেসের এ ঘোষণার দু'দিন পরেই কাসেদ এসে গেল।

সে বললো, 'সুলতান আইয়ুবী টায়ার থেকে সামান্য দূরে আছেন। সুলতান আপনাকে নৌবহর নিয়ে টায়ারের কাছে চলে যেতে বলেছেন। রাতে তিনি যখন টায়ার আক্রমণ করবেন তখন নৌবাহিনী যেন টায়ারের সমুদ্র বন্দরে অবস্থিত ওদের যুদ্ধ জাহাজগুলোর ওপর দ্রুত আক্রমণ করতে পারে।'

কাসেদ বিশেষ করে আরো বললো, 'সুলতান আপনাকে এখন থেকে সদা সতর্ক অবস্থায় থাকতে বলেছেন। সুলতানের ধারনা, তার আগমনের খবর পেলে খৃস্টান রণতরী আপনাদের ওপর আগাম আক্রমণ করে বসতে পারে।'

আল ফারেস কাসেদকে বিদায় জানিয়ে সেই রাতেই তার সমস্ত জাহাজকে একত্র হওয়ার আদেশ দিলেন। রউফ কুর্দীকে বললেন, 'সম্ভবত কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের যুদ্ধে নামতে হবে। তাই কাল রাতেই ভোজ সভার আয়োজন করো।' রউফ কুর্দী সব কটা জাহাজে এ ঘোষণা প্রচার করে দিল।

এন্ডুর কিস্তি নিয়মিতই আসতো জাহাজে। হাসান বিন আবদুল্লাহর গোয়েন্দা তাকে কয়েকটি স্থানে দেখেছিল। কিন্তু সে কোন ব্যবস্থা নেয়ার আগে নিজেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল। ফলে এন্ডুকে সনাক্ত করার আর কেউ রইলো না জাহাজে।

•

জাহাজ উপকূলের কাছে এসে থামলো। এন্ডুও তার নৌকা নিয়ে হাজির হয়ে গেল সেখানে। মেয়েরা আগের মতই তাকে উপরে ডেকে নিয়ে গেল। তারা তার কাছে থেকে কিছু কেনার বাহানায় এন্ডুর কানে কানে বলে দিল, 'কাল রাতে জাহাজ সব

একত্রিত হবে। জাহাজের উপরে ভোজ সভা হবে, নাচ গান হবে।'

সে মেয়েদের বললো, 'আমি রাতে যথাসময়ে নৌকা নিয়ে হাজির হয়ে যাবো। তোমরা তাকে তাকে থাকবে এবং সুযোগ মত সিঁড়ি ফেলে নেমে আসবে নৌকায়। তারপরের কাজ করবে আমাদের কমান্ডো বাহিনী।'

দেখতে দেখতে এসে গেল কাঙ্খিত রাত। ছয়টি জাহাজ পাল তুলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল। জাহাজের ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য অফিসাররা সবাই আল ফারেসের জাহাজে সমবেত হলো।

এশার নামাজের পর শুরু হলো আহারাদি পরিবেশন। মাল্লা ও সিপাইরা নিজ নিজ জাহাজে আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছিল। আল ফারেসের জাহাজেই মেয়ে দুটি নাচগান করছিল। অফিসাররা উপভোগ করছিল সে নাচগান।

মশাল জ্বালিয়ে আলোকিত করে তোলা হয়েছিল সব কটি জাহাজ। মাল্লারা অফিসারদের থেকে আলাদা হয়ে গান বাজনা ও আমোদ স্ফুর্তি করছিল।

এই আনন্দ উৎসব যখন তুঙ্গে তখন রাত গভীর। খৃস্টানদের দশ বারোটি জাহাজ আলো নিভিয়ে আল ফারেসের জাহাজের দিকে অগ্রসর হলো। তারা নতুন চাঁদের হালকা আলোতে ছিল বলে দূর থেকে তাদের দেখার উপায় ছিল না।

তারা যখন কাছে এলো তখন শেষ রাত। ক্লান্ত সিপাইরা অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অফিসাররাও ফিরে গেছে নিজ নিজ ক্যাবিনে। কেউ জানতে পারলো না তাদের অলক্ষ্যে এগিয়ে

আসছে মৃত্যু।

শেষ রাতের বিষন্ন প্রহরে একটি ছোট নৌকা আল ফারেসের জাহাজের দিকে অগ্রসর হলো। সবার অলক্ষ্যেই তা ভিড়লো আল ফারেসের জাহাজের সাথে। সন্তর্পনে সিঁড়ি নামিয়ে তাতে চড়ে বসলো সেই দুই মেয়ে। একটু পরেই চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

সহসা আল ফারেসের জাহাজের দিকে অগ্নিবান ও গোলা নিক্ষেপ শুরু হয়ে গেল। ঘুমন্ত সৈন্য ও মাল্লারা জেগে উঠলো গোলার আওয়াজ পেয়ে। দাউ দাউ করে জাহাজে জ্বলে উঠলো আগুন।

মাল্লা ও সৈন্যরা ছুটে বেরিয়ে এলো ডেকে। আর তখন এমন তীর বর্ষণ শুরু হলো যে, তীরের আঘাতে ডেকের ওপর লুটিয়ে পড়তে লাগলো জাহাজের সৈন্যরা। আল ফারেস ও জাহাজের ক্যাপ্টেনরা আকস্মিক আক্রমণের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু তখন আর তা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু এরা ছিল আইয়ুবীর সৈন্য। ভড়কে যাওয়ার শিক্ষা তিনি তাদের দেননি। এই অবস্থায়ও তারা পাল্টা জওয়াব দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। তারাও মেঞ্জানিক দিয়ে অগ্নি নিক্ষেপ শুরু করলো শত্রুর জাহাজের ওপর।

খৃস্টানরা পাল্টা আক্রমণের সম্মুখীন হবে ভাবতে পারেনি। তারা সতর্ক হওয়ার আগেই খৃস্টানদের একটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্থ হলো। কিন্তু খৃস্টান বাহিনীর কাজ তখন শেষ পর্যায়ে। তারা বেপরোয়া ভঙ্গিতে আরো কিছুক্ষণ গোলা বর্ষণ করে ফিরে

গেল।
যুদ্ধ যেভাবে শুরু হয়েছিল ঠিক সেভাবেই শেষ হয়ে গেল। আল ফারেসের পাঁচটি জাহাজই পুড়ে গিয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত হয়েছিল। যেহেতু জাহাজ জ্বলছিল, সেই আলোতে সৈন্যদের দেখে দেখে তীর বিদ্ধ করছিল খৃস্টানরা।
যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই আল ফারেস দেখতে পেলেন, একটি নৌকা তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাতে একজন পুরুষ ও দু'জন মেয়ে মানুষ। আল ফারেস দ্রুত জাহাজ থেকে একটি নৌকা নামিয়ে তাতে একদল নৌসেনাকে তুলে দিয়ে বললেন, 'ছুটে যাও। ওদেরকে ধরতে চেষ্টা করো।'
ওরা ধাওয়া করলো সে নৌকাকে। টের পেয়ে ওরা তীর ছুঁড়তে শুরু করলো। বাধ্য হয়ে পাল্টা তীর ছুঁড়লো মুসলিম নৌ সেনারা।
প্রথমেই তীরবিদ্ধ হলো নৌকার চালক এন্ডু। এরপর একটি মেয়ে। নৌকা থেমে গেল। তীর চালনা বন্ধ করে ওরা গিয়ে ধরে ফেললো নৌকাটি।
একটি মেয়ে তখনো বেঁচে আছে। তাকে বন্দী করা হলো। যুদ্ধের পর যখন আল ফারেসের কাছে তাকে হাজির করা হলো তখনই তিনি জানতে পারলেন, তার এ শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী কে?
মেয়েটি পরে সবই স্বীকার করলো। তার মুখ থেকেই আল ফারেস জানতে পারলেন এ ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে ছিল তাদেরই

হাত। মেয়েটি আরো জানালো, তারা এর আগে এক মুসলিম গোয়েন্দাকে হত্যা করে জাহাজ থেকে সাগরে ফেলে দিয়েছে। সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আল ফারেস।

এই জাহাজে কোন গোয়েন্দা ছিল এটা তো তার জানাই ছিল না। তার মনে পড়লো হাসান বিন আবদুল্লাহর সতর্কবাণী। কথার এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, 'শরীয়ত পাল্টে দেয়ার অধিকার কবে থেকে পেলে?'

তাইতো! শরীয়তের বিধান মেনে এই মেয়েদের যদি তিনি জায়গা না দিতেন তবে এই বিপর্যয়ের মুখে তাকে পড়তে হতো না। অনুশোচনায় তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত ও দগ্ধ হতে লাগলো। কিন্তু তাতে সর্বনাশের কোন হেরফের হলো না। মুসলমানদের যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়েই গেলো।

এ সময় সুলতান আইয়ুবী টায়ার থেকে সামান্য দূরে এক জায়গায় ক্যাম্প করে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকেই তিনি সোজা টায়ারের উপর আক্রমণ চালাতে চাচ্ছিলেন।

তিনি আক্রমণ করার আগের দিন জানতে পারলেন, আল ফারেসের নেতৃত্বাধীন ছয়টি জাহাজের পাঁচটিই পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এ খবরে সুলতান আইয়ুবী একেবারে থ মেরে গেলেন।

তিনি এমন দুঃসংবাদ শোনার আশা কখনও করেননি। এই খবরে তিনি এতটাই স্তম্ভিত হলেন যে, তিনি অভিযান চালানো স্থগিত করলেন। অভিযান স্থগিত করে তিনি আল ফারেস ও অন্যান্য ক্যাপ্টেনদের ডেকে পাঠালেন। আল ফারেস

সুলতানের সামনে হাজির হয়ে যা সত্য তাই তুলে ধরলেন। নিজের দুর্বলতা ও ত্রুটি স্বীকার করে বললেন, 'নৌবাহিনীর সকল কর্মচারী, মাল্লা ও সৈন্যরা কেমন নির্জীব ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের একঘেয়েমী দূর করার জন্য সে রাতে ভোজ সভার আয়োজন করেছিলাম।

কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি, আমাকে বোকা বানিয়ে আমারই জাহাজে দুই খৃস্টান গোয়েন্দা যাযাবরের পরিচয়ে অবস্থান করছিল। আমাদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে তারা এই বিপর্যয় সৃষ্টি করে।'

সুলতান আইয়ুবী এই পরিস্থিতিতে টায়ারে অভিযান চালানো ঠিক হবে কিনা এই নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তার সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন।

সৈন্যদের অবস্থা সবার কাছেই পরিষ্কার ছিল। তদুপরি কঠিন শীত পড়তে শুরু করেছে। সেই সাথে বৃষ্টিও হচ্ছে। সবাই বুঝতে পারছিল, এমন মওসুমে যুদ্ধ চালু রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

সৈন্যরা দ্রুত ও ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সুলতান বললেন, 'এ অবস্থায় নতুন করে তাদের ময়দানে পাঠালে তা তাদের জন্য জুলুম হয়ে যাবে। ক্রমাগত সাফল্যের পর একবার পরাজিত হলেই পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। পরাজিত শত্রু নতুন করে মনোবল ফিরে পাবে আর আমাদের সৈন্যদের মধ্যে জন্ম নেবে পরাজয়ের গ্লানি।'

তিনি নৌবাহিনীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বললেন, 'ওরা এ জন্যই

ধ্বংস হলো যে, দীর্ঘদিন ওরা বাড়ী ছাড়া ছিল। ফলে তাদের উদ্যমে ভাটা পড়েছিল। বায়তুল মোকাদ্দাসের মহান বিজয়ের পর এমন কিছু করা ঠিক নয়, যাতে মুসলিম বিশ্বে নতুন করে যে আবেগ ও জাগরণ সৃষ্টি হচ্ছে তা বাঁধাগ্রস্ত হয়। যদি জাহাজে নতুন বিপর্যয় দেখা না দিত তবে আমরা আগামীকাল টায়ারে আক্রমণ চালাতাম। এখন এই দুর্ঘটনার পর আদৌ অভিযান চালানো ঠিক হবে কিনা তোমরা ভেবেচিন্তে মতামত দাও।'

সুলতান আইয়ুবী সকলের মতামত গ্রহণ করলেন। সম্মিলিত মতামতের প্রেক্ষিতে তিনি আদেশ দিলেন, 'অভিযান আপাতত স্থগিত করা হলো। অধিকৃত অঞ্চল ছাড়া বাইরের যে সব সৈন্য আছে তাদের বেতন ও বোনাস দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দাও।' তিনি তার রক্ষী বাহিনীর কিছু সৈন্যকেও ছুটি দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তিনি অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে আক্রার দিকে যাত্রা করলেন।

২০ জানুয়ারী ১১৮৮। আক্রায় পৌঁছে তিনি আরো কিছু সৈন্যকে ছুটি দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। নিজেও সিদ্ধান্ত নিলেন কিছুদিন বিশ্রাম করবেন। মার্চ পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকলেন এবং পরবর্তী অভিযানের নকশা ও পরিকল্পনা তৈরী করতে লাগলেন।

•

ক্রুসেড যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয় সমস্ত ইউরোপকে একটা কঠিন ধাক্কা দিয়ে কাঁপিয়ে দিল।

সুলতান আইয়ুবী তার জীবনের লক্ষ্য ও স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন

এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ইসলামের সুরক্ষার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাস খৃস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করাই যথেষ্ট ছিল না, বিশ্বব্যাপী ইসলামী চেতনার বিস্তার ও তা সংরক্ষণও জরুরী ছিল।

সুলতান আইয়ুবী প্রথমেই এই পবিত্র শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করলেন। শহরের প্রাচীর সুদৃঢ় করার সাথে সাথে বায়তুল মোকাদ্দাসকে ক্রুসেড বাহিনীর আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য আশপাশের এলাকা দূর দূরান্ত পর্যন্ত নিজ অধিকারে নিয়ে নেয়ার কথা ভাবলেন। উপকূলবর্তী এলাকা নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়ার কথাও উপলব্ধি করলেন তিনি।

সুলতান আইয়ুবী আগেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। অবশিষ্ট যে দু'একটি স্থান ছিল সেখানেও তিনি তাঁর কমান্ডো বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। তারা একের পর এক আক্রমণ করে ওই সব অঞ্চল দখল করে চলছিল।

বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে খৃস্টান বাসিন্দারা পালিয়ে যাচ্ছিল। যে সব স্থানে খৃস্টান শাসন ছিল সেখানে মুসলমানদের জান-মাল ও জীবন ছিল দুর্বিসহ। মুসলমানদের পাইকারীভাবে হত্যা করা ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। আর এই হত্যাকান্ড চালাতো তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে।

কিন্তু সুলতান আইয়ুবী প্রতিশোধপরায়ণ আচরণ থেকে বিরত রইলেন। এমনকি ক্ষিপ্ত মুসলমানরা যেন কেউ কেবল খৃস্টান হওয়ার কারণে কারো ওপর চড়াও হতে না পারে তা নিশ্চিত করলেন।

তিনি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সেনাপ্রহরা বসালেন। অধিকৃত এলাকার খৃস্টান বাসিন্দারা যাতে নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারে সে জন্য তাদের সঙ্গে নিরাপত্তা প্রহরী দিলেন।

এ অধিকার কাউকে আন্দোলন বা দাবী করে আদায় করতে হয়নি। বরং সুলতান আইয়ুবী নিজে থেকেই এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের পর কোন বেসামরিক লোককে তাদের অতীত অপকর্মের জন্য শাস্তি না দিয়ে তিনি তাদের ক্ষমার চোখে দেখলেন।

তিনি শুধু তাদেরকেই যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক করলেন যারা ক্রুসেড বাহিনীর সৈন্য ছিল এবং সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। যুদ্ধে আহত বন্দী সৈন্যদের তিনি উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি সমগ্র ফিলিস্তিনে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেন।

সুলতান আইয়ুবীর প্রত্যেক বাহিনী হেডকোয়ার্টার থেকে যত দূরেই থাকুক না কেন, তারা যথারীতি সুলতানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ নিষ্ঠার সাথে পালন করছিল। যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল তখনো তিনি কব্জা করতে পারেননি সেগুলো দখল করার জন্য কমান্ডো বাহিনী প্রেরণ করলেন। কমান্ডো সৈন্যরা তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাতো। তাদের সে আক্রমণ ছিল চিতা বাঘের মতই ক্ষিপ্র ও বেপরোয়া।

পাহাড়ে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে সর্বত্র তারা ছুটে বেড়াতো শিকারী বাজের মতো সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। খৃস্টান বাহিনীর সন্ধান পেলে

তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছত্রভঙ্গ করে দিতো তাদের বাহিনী। তারা তাদের রসদপত্র কেড়ে নিতো। কেড়ে নিতো যুদ্ধের বাহন ঘোড়াগুলো আর সব অস্ত্রশস্ত্র।

এই কমান্ডো বাহিনীর বর্ণালী অভিযানের অসংখ্য ঘটনা ঠাঁই পেয়েছে ইতিহাসের পাতায়। তাদের ঘটনাবহুল, সাড়া জাগানো বীরত্বপূর্ণ কাহিনীগুলো আজও দুনিয়াব্যাপী প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করছে।

এই কমান্ডোদের দিয়েই সুলতান আইয়ুবী ফিলিস্তিনের প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করলেন। তারা সমগ্র ফিলিস্তিনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করলো।

প্রতি দশ জনের একটি দল পরিচালিত হতো একজন কমান্ডারের নেতৃত্বে। তারা আবার দুইজন বা চারজনের ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে টহল দিত অধিকৃত অঞ্চলে। কখনো কোন অভিযানে গেলে দশজনের ছোট্ট কমান্ডো বাহিনী শতাধিক খৃস্টান সৈন্যের কোন ক্যাম্পে বা কাফেলায় আক্রমণ করতে কখনো দ্বিধা করতো না।

তারা রাতের অন্ধকারে আক্রমণ চালিয়ে রাতেই আবার অদৃশ্য হয়ে যেতো। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সর্বশরীর রক্তাক্ত করেও শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নিত রসদপত্র।

মাঝে মাঝে তারা বেরিয়ে পড়তো শত্রুর সন্ধানে। চলে যেতো কোন পাহাড়ে। সেখানে টিলার পর টিলা পার হয়ে যেতো। উপত্যকা এবং গুহায় খুঁজে বেড়াতো দুশমন। কখনো পাড়ি জমাতো বিশাল মরুভূমিতে। কড়া রোদ বা তুহীন শীত

আটকাতে পারতো না তাদের।
এ ধরনের অভিযানে অনেক সময় ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়তে হতো ওদের। প্রাণপণ যুদ্ধ চালানো আর শত্রুশিবিরে আগুন দিতে গিয়েও মাঝে মধ্যে বিপদে পড়ে যেতো ওরা।
কখনো দেখা যেতো, জ্বলন্ত আগুন থেকে বেরোতে গিয়ে দুশমন বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছে। বেকায়দায় পড়ে অনেক সময় সেই আগুনে ওদের জ্যান্ত পুড়ে মরার ঘটনাও ঘটে যেতো। এ সব সৈন্যদের ভাগ্যে কখনো দাফন কাফন জুটতো না। এ রকমই ছিল কমান্ডোদের জীবন।
শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া গেরিলাদের দেখলে তারা আজরাইলের কথাও ভুলে যেতো। মনে হতো তাদের ওপর আল্লাহর গজব নেমে এসেছে। তারা চরম অভিশাপের মত চড়াও হতো দুশমনের ওপর।
এই জানবাজদের ওপর নির্ভর করেই সুলতান আইয়ুবী বায়তুল মোকাদ্দাসে জয় লাভের পর তাদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সমস্ত ফিলিস্তিনে। তারা বাঘের মত শিকার খুঁজে বেড়াতো আর হামলা করতো সিংহের মতো।
সুলতান আইয়ুবীর এই কমান্ডো বাহিনী সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ষ্ট্যানলি লেনপোল লিখেছেন, 'এই সব মুসলমান গেরিলারা আমাদের নাইটদের মত লোহার ভারী পোষাক পরতো না বটে, তবে আমাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও নাইটদের নাকানি চুবানি খাওয়াতে ওরা ছিল ওস্তাদ। তারা থাকতো অদৃশ্য অবস্থায়। আঘাত করার জন্য তাদের খুঁজে পাওয়া যেতো না।

আবার তারা আক্রমণ চালালে পালানোর সুযোগও পেতো না আমাদের সৈন্যরা। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঘোড়াগুলো ছিল তাদের দখলে।

এসব মুসলমান কমান্ডোরা কখনও উদাস বা দুর্বল হতো না। তারা মৌমাছির মতই ছিল অনন্ত পরিশ্রমী। যদি তাদের থেকে বাঁচতে চাও তবে তাদের চোখের আড়ালেই থাকবে। তারা পাহাড়ী ঢলের মতই খরস্রোতা বেগবান। তাদের সয়লাব ক্রুসেড বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো।

আমাদের নাইটদের প্রতিটি পদক্ষেপ তারা তছনছ করে দিত। আমাদের ক্রুসেড বাহিনীর অগ্রযাত্রা থমকে দাঁড়াতো তাদের সামনে পড়লে। এমন বেপরোয়া বাহিনীর সাক্ষাত পৃথিবী খুব কমই পেয়েছে।'

বর্তমানে যে স্থানটি ইসরাইল নামে পরিচিত, সুলতান আইয়ুবীর যুগে সে অঞ্চলটিই ছিল বায়তুল মোকাদ্দাস। তিনি সে শহর ও এলাকা খৃস্টানদের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য যে লড়াই করেন সে লড়াইয়ে আল্লাহর হাজারো সৈনিক তাদের রক্তের নজরানা পেশ করেছিল।

সুলতান আইয়ুবী ও তার সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দানে যে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন, যেভাবে মেতে উঠেন ধ্বংসের খেলায় তাতে মনে হতে পারে তাদের অন্তরে কোন দয়ামায়া নেই।,

কিন্তু যখন প্রতিপক্ষ আত্মসমর্পন করতো তখন তাদের প্রতি এমন দয়া মায়া প্রদর্শন করা হতো, প্রতিপক্ষও তা দেখে বিস্মিত

ও অভিভুত হয়ে উঠতো। ইসলামের এই সৌন্দর্য সত্যি পৃথিবীবাসীর জন্য বিস্ময়কর ব্যাপার।

ন্যায়নীতি, সততা, সত্য ও সুন্দরের জন্যই ইসলামের লড়াই। এখানে ব্যক্তিগত ঘৃণা, ক্ষোভ ও প্রতিহিংসার কোন অবকাশ নেই। ইসলাম কোন ধর্ম, বর্ণ, বংশ বা জাতির কল্যাণের জন্য আসেনি, এসেছে সভ্যতার কল্যাণের জন্য, মানবতার কল্যাণের জন্য।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন জগতবাসীকে। তাই তাকে বলা হয় রাহমাতুল্লিল আলামীন– সমগ্র বিশ্ব জগতের রহমত। সুলতান আইয়ুবী ও তার সৈন্যরা এই সত্যের বলিষ্ঠ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। তাই শত্রুরাও তাদের সেবা ও মমতার স্পর্শ পেয়েছিল।

খৃস্টান ঐতিহাসিকরা সুলতান আইয়ুবীর এই মমতাপূর্ণ আচরণের জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তাদের গ্রন্থে। তাদের লেখায় পাওয়া যায় তাঁর মহত্ব ও করুণার অসংখ্য বিবরণ। এই মহত্ব থেকে যেমন বঞ্চিত হয়নি কোন সম্রাট বা রাণী, তেমনি বঞ্চিত হয়নি কোন সাধারণ সৈনিক, খৃস্টান জনসাধারণ, নারী, শিশু বা তরতাজা যুবক।

খৃস্টানদের এক রাণী। তার নাম ছিল সাবিলা। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ খৃস্টান সম্রাট রিমান্ডের স্ত্রী। হাতিনের যুদ্ধের সময় তিনি তিবরিয়ার শাসক ছিলেন। সম্রাট রিমান্ড হাতিনের যুদ্ধের সময় ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী সাবিলা তিবরিয়ার কেল্লা সুলতান আইয়ুবীর হাতে তুলে দিলেন। সুলতান আইয়ুবী

এই মহিলাকে বন্দী না করে সম্মানের সাথে তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

হাতিনের যুদ্ধেই সুলতান আইয়ুবী বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসক গে অব লুজিয়ানকে যুদ্ধবন্দী করেছিলেন। বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয়ের পর যখন সুলতান আইয়ুবী আক্রাতে এসে ইতি টানলেন এই পর্বের যুদ্ধের, তখন তিনি সংবাদ পেলেন, রাণী সাবিলা তাঁর সাথে দেখা করতে আসছেন। সুলতান আইয়ুবী তাঁর পথ আটকে ধরার পরিবর্তে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন।

'সালাহউদ্দিন!' রাণী সাবিলা পরাজয় বরণ করার পরও নিজেকে রাণীই দাবী করতেন। কারণ তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ত্রিপোলীর রাণী ছিলেন।

তিনি সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কি জানা আছে, যুদ্ধে কত হাজার বা কত লাখ খৃস্টান তাদের ভিটামাটি থেকে বঞ্চিত হয়েছে? তারা ভিটা ছাড়া ও গৃহহীন হয়েছে আপনার আদেশে, আপনি কি তা অস্বীকার করতে পারেন?'

'আর যে পরিমাণ মুসলমানকে খৃস্টানরা পাইকারী হারে হত্যা করেছে তাদেরকে কার আদেশে হত্যা করা হয়েছে?' সুলতান আইয়ুবী তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন। তিনি এ প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বললেন, 'যদি আমি রক্তের প্রতিশোধ রক্ত দিয়েই নিতে চাইতাম, তবে আপনিও স্বীকার করবেন, এ মুহূর্তে একজন খৃস্টানও আর বেঁচে থাকতো না।' সুলতান আইয়ুবী রাণী সাবিলাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি এই

অভিযোগ করতেই এখানে এসেছেন?'
'না, আমি কোন অভিযোগ নিয়ে আসিনি।' রাণী উত্তর দিলেন, 'আমি একটি আবেদন নিয়ে এসেছি। গে অব লুজিয়ান আপনার কাছে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আছে, আমি তাঁর মুক্তির আবেদন নিয়ে এসেছি।'
'আমি আপনাকে একথা জিজ্ঞেস করবো না, আপনি তাকে কেন মুক্ত করতে এসেছেন?' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তবে আমার জানা প্রয়োজন, আপনি তাঁকে কোন শর্তে মুক্ত করতে চান?'
'যদি আপনার সন্তান বা ভাই বন্দী থাকে তবে কি আপনি তাদের মুক্ত করতে চেষ্টা করবেন না?' রাণী সাবিলা জিজ্ঞেস করলেন।
'আমার যে সব কমান্ডার, অফিসার ও সৈন্যরা আপনাদের কাছে যুদ্ধবন্দী আছে তারা সবাই আমার ভাই।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'যদি আমি নিজেও কয়েদী হয়ে যাই তবুও আমি আপনার কাছে মুক্তির আবেদন করবো না। আমার কোন ছেলে বা ভাইও আপনার কাছে আমার মুক্তির জন্য যাবে না।'
'সালাহউদ্দিন!' রাণী সাবিলা বললেন, 'আপনি নিজেও একজন বাদশাহ। আপনি কি বোঝেন না, একজন সম্রাটের বন্দী হয়ে পড়ে থাকা কত বড় অপমানের কাজ? তিনি জেরুজালেম ও তার আশপাশের অঞ্চল সমূহের শাসক ছিলেন।'
'জেরুজালেম নয় বলুন বায়তুল মোকাদ্দাস। কারণ এখন আর ওই অঞ্চল জেরুজালেম নেই।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আগ্রাসনের মাধ্যমে যারা ওই অঞ্চলের স্বাধীনতা হরণ করে

ক্ষমতা দখল করেছিল গে অব লুজিয়ান তার শাসক ছিলেন। কোন আগ্রাসীকে আমি বাদশাহ বলতে পারি না।

হাঁ, আপনি যদি বলেন, তিনি ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য মুসলমানদের পরাজিত করে সেখানে খৃস্টান শাসন প্রতিষ্ঠা করছিলেন, তবে আমি তা অস্বীকার করবো না। এ ক্ষেত্রে আমি তাকে এবং আপনাকেও সম্মান করবো।

আমি সেই লোককে মনে প্রাণে সম্মান ও শ্রদ্ধা করি যিনি তার আপন বিশ্বাস ও ধর্মকে রক্ষা ও যত্ন করেন। তার সে ধর্ম ভিত্তিহীন বা মিথ্যা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন। আর আমি নিজেকে বাদশাহ মনে করি না, অন্য কোন ব্যক্তিকেও বাদশাহ মনে করি না। বাদশাহ শুধু একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, যিনি আমাদের স্রষ্টা ও মালিক, মুনীব। আমরা তার বান্দা এবং শুধু তারই সৈনিক ও মুজাহিদ। আমরা আল্লাহর সৈনিক হিসাবে দায়িত্বশীলতার সাথে নিজের কর্তব্য সম্পন্ন করার চেষ্টা করি।'

'আমরাও খোদার শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই সচেষ্ট আছি।' রাণী বললেন।

'যদি আপনি খোদার শাসনে বিশ্বাসী হতেন, তবে আপনি কোন বাদশাহর মুক্তির আবেদন নিয়ে আমার কাছে আসতেন না। খোদার কাছেই তার মুক্তি চাইতেন। আপনি যদি বলতেন, বাদশাহর সৈনিককে মুক্ত করে দাও, সেটাই হতো যুক্তিযুক্ত।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আপনার একথা অস্বীকার করা উচিত নয়, আরবের এ অঞ্চল আমাদের, আপনাদের নয়।

এখানে খৃস্টানরা অনুগত নাগরিক হিসেবে শান্তিতে থাকতে পারবে, বাদশাহ হয়ে নয়। আপনার খৃস্টান বন্ধুদের বলে দিন, তারা যেন মানুষ হত্যার খেলা বন্ধ করে এবং অকারণ ধ্বংসযজ্ঞ চালানো থেকে বিরত থাকে। আর তারা যদি শান্তিতে এখানে থাকতে না পারে তবে যেন এখান থেকে চলে যায়। ব্যর্থ আক্রমণকারী ও পরাজিত সৈনিকদের কর্তৃত্ব এ দেশের মানুষ কখনোই মেনে নেবে না।'

'আপনার এ আদেশ কি বিদ্বেষপ্রসূত নয়। কেবলমাত্র খৃস্টান হওয়ার অপরাধে আপনি এখান থেকে ওদের তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন?'

'না, আমার এ আদেশের মধ্যে বিদ্বেষের কোন ছোঁয়া নেই। দেখুন, আপনি নিজেকে খোদার শাসনে বিশ্বাসী মনে করেন অথচ আপনারা নিষ্পাপ মেয়েদের পাপের শিক্ষা দান করেছেন আর তাদের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিতে শিখিয়েছেন।

আপনারা আমাদের ধর্মীয় নেতাদের ছদ্মবেশ ধারণ করে জনসাধারণকে প্রতারিত এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ আহত করতে চেষ্টা চালিয়েছেন। আপনারা অর্থকড়ি, সুন্দরী মেয়ে ও মাদক বিলিয়ে আমাদের জাতির মধ্যে গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতক সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছেন এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে ফায়দা লুটতে চাচ্ছেন।

কিন্তু আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে এমন কিছুই করিনি। তবে হ্যাঁ! ক্রুসেড রাণী! আমি স্বীকার করছি, আপনারা এসব ক্ষেত্রে অনেকটাই সফল হয়েছেন। আপনারা ঐক্যবদ্ধ ইসলামী

সালতানাতকে খন্ড বিখন্ড করতে পেরেছেন। মুসলমানদের দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করাতে পেরেছেন।'

'হে আমার প্রিয় সুলতান!' রাণী সাবিলা তাঁকে গভীর স্বরে বললেন, 'আমি আপনার কাছে জটিল ও দীর্ঘ তত্ত্বকথা শুনতে আসিনি। আমি শুধু একটি আবেদন নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, আর তা হচ্ছে আপনি গে অব লুজিয়ানকে মুক্ত করে দিন।'

'হ্যাঁ, আমি জানি আপনার আবেদন পূরণ হলে আপনি আর আমার কাছে আসবেন না।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি আপনাকে একথাও বলে দিতে চাই, আপনি শুধু আমার এই সামিয়ানার মধ্য থেকে বিদায় হচ্ছেন না বরং আমাদের এলাকা ছেড়ে চিরদিনের জন্য বিদায় হয়ে যাচ্ছেন। আর কখনও এদিকে আসার আশা করবেন না। যদি কখনও এদিকে আসার দুঃসাহস করেন, তবে ভূমধ্যসাগরের পানি আপনার জাহাজকে আলিঙ্গন করবে। আমি আর আপনাকে বেশী উপদেশ দিতে চাই না। আমি আপনার কাছে একটি আবেদন জানাচ্ছি, যা আপনি আপনার সকল খৃষ্টান ভাইদের জানিয়ে দিবেন।

কোথায় আপনাদের সেই বিশাল ক্রুশ যা ছুঁয়ে শপথ করে আপনারা সকলেই আরব ভূখন্ডে এসেছিলেন আরববাসীদের নির্মূল করতে? কোথায় সেই ক্রুশ, যার সাহায্যে আপনারা মসজিদুল আকসা ও খানায়ে কাবাকে ধ্বংস করে সেগুলোকে আপনাদের গীর্জা বানাতে চেয়েছিলেন?

সেই ক্রুশ এখন আমার কাছে। আপনাদের সংকল্পের কথা

ভুলে যান। এখন আপনাদের বাঁচা-মরা আমাদের করুণার উপর নির্ভর করছে। আপনারা যাকে জেরুজালেম বলেন এখন সেটা বায়তুল মোকাদ্দাস আর চিরকাল বায়তুল মোকাদ্দাসই থাকবে।'

'সুলতান! ইতিহাসের চাকা এক জায়গায় বসে থাকে না। আর আপনার জাতি যেভাবে গাদ্দার হওয়ার জন্য হা করে বসে থাকে সেখানে এমন উক্তি আপনি করতে পারেন না। আজ যা সত্য কাল তা সত্য নাও থাকতে পারে।' রাণী সাবিলা বললেন, 'আমাদের সৈন্যের অবস্থা চিরকাল এমন দুর্বল থাকবে এ কথা আপনি বলতে পারেন না।'

'সত্যকে অস্বীকার করে লাভ কি রাণী!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'এতকাল আমাদের ধোঁকা দিয়েছেন আর এখন নিজেকেই ধোঁকা দিচ্ছেন? এই ধোঁকাই আপনাদের পরাজয়ের কারণ। আমার সৈন্যরা কোনদিনই ক্রুসেড বাহিনীর চেয়ে বেশী ছিল না, অস্ত্রসম্ভারেও কোনদিন অধিক উন্নত ছিল না। আমার সৈন্যদের ভাগ্যে কোনদিন লৌহ শিরস্ত্রাণ জোটেনি। আমার সেনাপতিদের ভাগ্যে এমন কোন সুন্দরী মেয়েও জোটেনি যেমন আপনাদের সেনাপতিদের কাছে জোড়ায় জোড়ায় থাকে। সুতরাং গোপন কথা কিছু আপনাকে বলে দেই, আমার সৈন্যদের মাঝে যে শক্তি আছে সে শক্তি আপনার সৈন্যদের মধ্যে নেই। সে শক্তিকে আমরা বলি প্রিয় নবীর ভালবাসা ও ঈমান। যদি আপনার বিশ্বাস সঠিক হতো তবে আপনার জাতি খোদার প্রিয় হতো। কিন্তু যে খোদা এক লা-শরীক আপনারা

তাঁকে এক সন্তানের পিতা বানিয়ে রেখেছেন। আপনারা খোদাকে মানুষের স্তরে নামিয়ে এনেছেন এবং তার শাসন ক্ষমতাকে অস্বীকার করে নিজেকে বাদশাহ বলে প্রচার করছেন।'

'আপনি কি আমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছেন?' রাণী বললো।

'রাণী সাবিলা!' সুলতান আইয়ুবী তাঁর কণ্ঠে রুক্ষ্নতা লক্ষ্য করে বললেন, 'আমার খোদা কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা তাদেরকে বুদ্ধি দিয়েছি বোঝার জন্য, কিন্তু তারা চিন্তা করে না। আমি চোখ দিয়েছি দেখার জন্য, কিন্তু তারা লক্ষ্য করে না। আমি কান দিয়েছি শোনার জন্য, কিন্তু তারা শ্রবণও করে না। কারণ আমি যখন কাউকে শাস্তি দিতে চাই তখন তার অন্তরে ও বুদ্ধি বিবেকের উপর সিল মেরে দেই। আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলছি না। আমি শুধু এ কথাই বলছি, বিজয় সেই জাতিরই হাতের মুঠোয় থাকে, যে জাতির অন্তরে ঈমানী শক্তি প্রবল থাকে।

আপনারা আমাদের জাতির নেতাদের অন্তর থেকে ধন সম্পদ, নারী ও মদের নেশা জাগিয়ে ঈমান শেষ করে দিয়েছিলেন। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছি। সে জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দিয়েছেন।

কিন্তু মনে রাখবেন, সমস্ত জাতিই পাপিষ্ঠ হতে পারে না। জাতির নেতা ও শাসকগোষ্ঠী বিপথগামী হলে তার শাস্তি জাতিকে বহন করতে হয় বটে, কিন্তু একটা সময় আসে যখন

জাতির সন্তানদের আত্মোপলব্ধি ঘটে। তখন তাদের আর দাবিয়ে রাখা যায় না।'

'এ কথার কোন জবাব এখন আমার কাছে নেই সুলতান। তবে কোনদিন যদি সুযোগ আসে তখন আমি এর জবাব দেবো।'

রাণী বললেন, 'আপনাদের প্রকৃত শক্তি কোথায় আমরা তা অনুসন্ধান করছি।'

'এতো কষ্ট করার দরকার কি? আমিই বলে দিচ্ছি আমাদের প্রকৃত শক্তির ঠিকানা। যখন আমরা পরাজয় বরণ করি তখন সে পরাজয়ের দায়িত্ব আমরা নিজের কাঁধে তুলে নেই। আমি আমার সেনাপতিদেরও বলেছি, যদি ভুল হয়ে যায় তবে সে ভুল আমাদের। যদি ভাগ্যের পরিণাম হয় তবুও তা সবারই ভাগ্যের যোগফল। যদি পরাজয়ের গ্লানি আমরা একে অপরের উপর চাপিয়ে নিজেকে নিরপরাধ মনে করি তবে তা আমাদের জন্য আরও পরাজয় বয়ে আনবে।

এখন মুসলিম দেশগুলো দুটি দেহে বিভক্ত হয়ে আছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে পরবর্তীতে তা আরও বহু খন্ডে রূপান্তরিত হবে। আর কাফেররা তা একটা একটা করে গ্রাস করবে। আমাদের এ পরাজয়কে আবার বিজয়ে রূপান্তরিত করতে হলে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তুলতে হবে আমাদের।

সম্মানীতা রাণী! আমাদের গৃহযুদ্ধের কারণ ছিল আল মালেকুস সালেহ, ছাইফুদ্দিন গাজী ও গুমাস্তগীনের মত কতিপয় গাদ্দার! তখন আমার সেনাপতিদের আমি বলেছিলাম, জাতিকে এক করা আমাদের দায়িত্ব। যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তবে

আমাদের বিজয় কেউ রুখতে পারবে না।

বিজয়ের জন্য আমরা প্রথমে গাদ্দারদের শায়েস্তা করেছি। তারপর যখন সমগ্র জাতিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ময়দানে নেমেছি তখন প্রতিটি যুদ্ধই আমাদের জন্য বিজয়ের পয়গাম নিয়ে এসেছে। এরপর আমরা অনেক রক্ত দিয়েছি এবং রক্ত শপথের মধ্য দিয়ে জাতির প্রতিটি আত্মাকে আজ একসূত্রে গেঁথে নিতে সক্ষম হয়েছি। হাজারো শহীদের রক্তে গড়া এ ঐক্যে আর কোনদিন ফাটল ধরতে দেবে না আল্লাহর সৈনিকরা। অতএব হে রাণী! আপনি দেখতে পাবেন জীবন দিয়ে গড়া ঐক্য আর কোনদিন ছিন্ন হবে না।'

'সুলতান! ভবিষ্যত কারো মুঠোর মধ্যে বন্দী থাকে না। সময়ের সন্তানেরা তাদের যোগ্যতা দিয়ে সময়কে বশ করে নেয়। কিন্তু ইতিহাস বলে, পরাজিতরা নিজেদের ভাগ্য গড়ার জন্য যেভাবে সচেষ্ট থাকে ক্ষমতাসীনরা ততোটাই উদাস থাকে নিজেদের ব্যাপারে। ফলে ক্ষমতার চাকা আবার ঘুরে যায়। আপনি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ছিলেন বলে আপনার জাতি আজ বিজয়ের আসনে। কিন্তু আপনার মৃত্যুর পর? আপনার এ বিজয়কে ধরে রাখতে হলে দরকার হবে আপনার মতই আরেক মুজাহিদ। কিন্তু আইয়ুবী কোন জাতির মধ্যে প্রতিদিন জন্ম লাভ করে না। সুতরাং ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করাই ভালো।'

'তাহলে অতীতের কথা বলি।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'সে সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনারা সৈন্য নিয়ে মদীনা

মনোয়ারার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন।
তখন যিনি ছিলেন দোর্দন্ড প্রতাপশালী সম্রাট আজ তারই মুক্তির আবেদন নিয়ে আপনাকে হাজির হতে হয়েছে আমার সামনে। কেন? এটা হচ্ছে সেই সব সম্রাটদের অপকর্মের ফল। আমি বিশ্বাস করি, আইয়ুবী এ বিজয়ের মূল ফ্যাক্টর নয়, নিমিত্ত মাত্র। এই সময়ের মুসলমানদের ঈমান আল্লাহর রহমত লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। সেই রহমত তাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে বাছাই করেছেন তাঁর সামান্য এক গোলাম হিসাবে।
আল্লাহ জাল্লে শানুহু আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন, সে দায়িত্ব আমি জানপ্রাণ দিয়ে পালনের চেষ্টা করেছি। এই বিজয় আমাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রমাণ। বিজয় তাঁর হাতে এবং তিনি যখন যাকে ইচ্ছা সে বিজয় দান করতে পারেন।'
রাণী সাবিলা সুলতান আইয়ুবীর কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। সুলতানের কথা শুনে তাঁর ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি এসে গেল। তিনি ঠোঁটে সে হাসি ধরে রেখেই বললেন, 'আপনি সেনাপতি না হয়ে মুবাল্লিগ হলেও ভাল করতেন। আপনি যথেষ্ট কৌশলে দাওয়াত দিতে পারেন। আপনি এত কথা না বলে কেন বলছেন না, রাণী সাবিলা, আপনি ইসলাম কবুল করলে আমি খুব খুশী হবো?'
'না, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি আবারও বলছি, আপনাকে ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ করা আমার দায়িত্ব নয়।

আমার দায়িত্ব আপনার চোখের আবরণ খুলে দেয়া।'

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আপনার হাসিই বলে দিচ্ছে, আপনি আমার এখান থেকে বের হয়েই আমার কথাগুলো মন থেকে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলবেন, যেভাবে আপনাদের সৈন্য ও কমান্ডাররা হাতিনের যুদ্ধে অস্ত্র ত্যাগ করেছিল। আমি এসব কথা আপনাকে শুধু এ জন্যই বলছি যে, এটা আমার আল্লাহ ও আমার প্রিয় রাসূলের নির্দেশ। আমার আল্লাহ আমাকে হুকুম দিয়েছেন, যার চোখে পর্দা পড়ে গেছে তার চোখের পর্দা খুলে দাও, আর তাকে বলে দাও, সত্য কোনটি আর বাতিল কোনটি। সম্মানীতা রাণী। আপনার স্বামী ভাড়াটে খুনীচক্র হাসান বিন সাবাহর লোক দিয়ে চার বার আমাকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিল। একদিন যখন খুনীরা আমাকে আক্রমণ করলো তখন আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। কিন্তু তাতে কি হলো? তারা নিজেরাই নিজেদের হত্যাকারী হয়ে গেল। আরেকবার তারা আমাকে ঘিরে ফেলেছিল। কিন্তু আল্লাহ আমাকে অক্ষতভাবে রক্ষা করলেন, অথচ তাদের একজনও বাঁচতে পারেনি।

সম্মানীতা রাণী! জীবন মৃত্যু আর ক্ষমতার মালিক আল্লাহ এখনো কি এ কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি এ সত্যকেও কি অস্বীকার করবেন, আপনার স্বামী বার বার আমাকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছিলেন যাদের দিয়ে শেষে সেই খুনী চক্রের হাতেই তিনি নিহত হয়েছিলেন? যাকে আল্লাহ মারতে চান তাঁকে কেউ বাঁচাতে পারে না আর আল্লাহ যাকে

রক্ষা করেন কেউ তাকে মারতে পারে না।'

'মাননীয় সুলতান! আপনি এখন বিজয়ের আনন্দে বিভোর। চোখে রঙিন স্বপ্ন। এ সময় গল্প করতে সবারই ভাল লাগে। বলুন আর কি বলবেন? ক্রুশটি আপনি কি করেছেন?'

'ওটি আমার কাছেই আছে রাণী।' সুলতান বললেন, 'হাতিনের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে আপনার স্বামী পালিয়ে গেলে ক্রুশটি আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসি। আপনি আমার সাথে যুদ্ধ না করেই তিবরিয়া দুর্গ সমর্পণ করে দেয়ার সময় ক্রুশের ব্যাপারে কিছু জানতে চাননি বলে আমিও কিছু জানাইনি আপনাকে। আপনারা সকলেই যে ক্রুশের উপর হাত রেখে যুদ্ধ করার শপথ নিয়েছিলেন সে ক্রুশটি আপনাদের পাদ্রীর হাতেই ছিল। তিনি যখন আহত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তখন ক্রুশটি আমি তুলে নেই। সেই ক্রুশটি এখনো আমার কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে।'

সুলতান বললেন, 'আমি খুব অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, আপনি শুধু গে অব লুজিয়ানকে মুক্ত করতে এসেছেন, অথচ আপনাদের পবিত্র ক্রুশের ব্যাপারে আপনি কিছুই বলেননি।'

'আমি যখন এ সব কথা তুলিনি তখন আপনি কেন তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন?' রাণীর ক্ষুব্ধ কণ্ঠ।

'এ জন্য যে, আপনি যাতে খোদার স্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝতে পারেন।' সুলতান আইয়ুবী তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললেন, 'আপনার চোখের উপরও স্বপ্ন ভাসছে। যে স্বপ্নে আছে শাসন ক্ষমতা লাভের অলীক লোভ। কিন্তু রাণী! আপনি এ সত্যকে

অস্বীকার করতে পারবেন না, আপনার মধ্যে আছে নারীর সৌন্দর্য। আপনাকে এ বলে খুশী করতে পারি, আপনি সত্যি একজন সুন্দরী রমনী।' সুলতান বললেন, 'কিন্তু আপনার জন্য দুঃসংবাদ কি জানেন? এ সৌন্দর্য আমাকে মোটেই প্রভাবিত করতে পারবে না। আপনার এ অর্ধ উলঙ্গ দেহ আমাকে আমার পথ থেকে সরাতে পারবে না। আমার বিবেচনাবোধকে মোটেও টলাতে পারবে না।'

রাণী সাবিলা একজন সাধারণ নারীর মতই হেসে ফেললেন। বললেন 'আমাকে আগেই জানানো হয়েছিল, আপনি পাষাণ।'

সুলতান আইয়ুবীও হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, এমন অবস্থায় আমি পাথর! কিন্তু আমি এমন নরম যে, ঈমানের পরশে গলে মোম হয়ে যাই। তখন আমার দয়ার সাগরও উথ্‌লে উঠে। দৈহিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বা সাজসজ্জা মানুষকে তার কাজে সাহায্য করে না, জাতিরও কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। এ ধরনের রূপের প্রদর্শনীতে খোদাও অসন্তুষ্ট হন।'

'আমি আপনার মনে দয়ার আবেগ জাগাতে এসেছি।' রাণী সাবিলা বললেন, 'আপনি গে অব লুজিয়ানকে মুক্তি দিন। আমি জানি, আপনি একজন খাঁটি মুসলমান। আর এও জানি, খাঁটি মুসলমানের কাছে আশ্রয় চাইলে শত্রুও আশ্রয় এবং নিরাপত্তা পেয়ে যায়। আমি আপনার কাছে সেই ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছি।'

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি আপনার আবেদন এই শর্তে মঞ্জুর করতে পারি, তিনি আমার বিরুদ্ধে আর কখনো অস্ত্রধারণ

করবেন না এ ব্যাপারে লিখিত অঙ্গীকার করবেন।'
রাণী সাবিলা বললেন, 'সে লিখিত অঙ্গীকারনামাই দেয়া হবে আপনাকে। আমি আপনাকে আরো বলতে চাই, যদি গে অব লুজিয়ান কখনো তার অঙ্গীকার থেকে সরে দাঁড়ায় তবে তাকে আপনি যে কোন সময় হত্যা করতে পারবেন। প্রয়োজনে তাকে ধরার ব্যাপারে আমি আপনাকে সহযোগিতা করবো।'
এ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, সুলতান আইয়ুবী সম্রাট গে অব লুজিয়ানকে মুক্তি দিয়ে রাণী সাবিলার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আলোচনা শেষে সন্তুষ্ট মনে রাণী সাবিলা চলে গেলেন নিজের রাজ্যে।
সুলতান আইয়ুবী সে দিনই গে লব লুজিয়ানকে মুক্তির সংবাদ দিতে দুত পাঠালেন দামেশকে।
চার দিন পর। গে লব লুজিয়ানকে সুলতান আইয়ুবীর সামনে এনে হাজির করা হলো। সুলতান আইয়ুবী দোভাষীর সাহায্যে ইউরোপীয় খৃস্টান সম্রাট গে লব লুজিয়ানকে জানালেন তার শর্তের কথা। বললেন, 'আগে শর্তের বিষয় ভাল করে বুঝে নিন।'
দোভাষীকে বললেন, 'এই অঙ্গীকারনামা তার ভাষায় অনুবাদ করে শুনিয়ে দাও। আর যদি তিনি চান যে অঙ্গীকারনামা তার ভাষায় লিখা হোক তবে তাই লিখে দিয়ে স্বাক্ষর নিয়ে নাও।'
গে অব লুজিয়ান শর্ত শুনে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। সুলতান দোভাষীকে বললেন, 'তাকে একথাও বলে দাও, এই শর্তের বাইরে তার সাথে আর কোন কথা নেই আমার। আমি

তার সম্পর্কে জানি। যদি সে অঙ্গীকার বিরুদ্ধ কিছু করে ও আমার সাথে যুদ্ধ করে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। তাকে আরও বলে দাও, আমি তাকে রাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুক্ত করছি না। আমি তাকে বুঝিয়ে দিতে চাই, তার মত অপরাধীকেও মুসলমান ক্ষমা করতে পারে।'

তিনি বললেন, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করে যাচ্ছি। আমি কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে চাই না। তিনি যেখানে যেতে চান আমাদের রক্ষীরা তাকে সম্মানের সাথে ও নিরাপদে সেখানে পৌঁছে দেবে।'

গে লুজিয়ান বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসক ছিলেন। তিনি হাতিন রণাঙ্গণ থেকে যখন যুদ্ধবন্দী হন তখন ভাবতেও পানেনি আবার কোনদিন তিনি মুক্ত পৃথিবীর মুখ দেখতে পারবেন।

মুসলমানদের ওপর তিনি যে নির্যাতন চালিয়েছেন এবং সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যেভাবে সক্রিয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাতে সুলতান যদি তাকে মৃত্যুদন্ড দেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সুলতান তাকে কোন বিনিময় ছাড়া 'শুধু তার বিরুদ্ধে আর কোনদিন যুদ্ধ করবো না' এটুকু অঙ্গীকার নিয়েই মুক্ত করে দেবেন এ কথা তখনো তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তিনি মুখ তুলে সুলতানের দিকে চাইলেন। সুলতান দোভাষীকে বললেন, 'শর্তে সম্মত থাকলে তাকে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে বলো।'

দোভাষীর কথা শুনে উঠে দাঁড়ালেন গে অব লুজিয়ান। এগিয়ে গেলেন সুলতান আইয়ুবীর দিকে। সুলতান আইয়ুবী হাত

বাড়িয়ে দিলেন, গে অব লুজিয়ান স্বসম্মানে করমর্দন করে বললেন, 'সুলতান আইয়ুবী, আপনি সত্যি মহান! সত্যি মহানুভব!'
অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে সুলতানের ক্যাম্প থেকে বিদায় নিলেন গে অব লুজিয়ান।

গে অব লুজিয়ানের মুক্তির ঘটনা ইউরোপের ঐতিহাসিকদের প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। এ ঘটনা তারা তাদের বইতে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যদিও সবার বিশ্লেষণ এক রকম নয় কিন্তু ঘটনা বর্ণনা সবার একই রকম। কেউ কেউ বলেছেন, 'তাঁর মুক্তি রাণী সাবিলার কৃতিত্ব।' তারা এ কথা বলতেও দ্বিধা করেননি যে, 'সুলতান আইয়ুবী রাণী সাবিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গে অব লুজিয়ানকে মুক্ত করেছেন।' তাদের এ বিশ্লেষণ মেনে নিলে বলতে হয়, সুলতান আইয়ুবী মহত্বের কারণে তাকে মুক্তি দেননি। কোন মায়া মমতা বা মানুষের প্রতি দরদও এ ক্ষেত্রে কাজ করেনি।
কেউ কেউ বলেছেন, 'নিজেকে মহত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি একজন সম্রাটকে মুক্তি দিয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।' এতে মনে হতে পারে, সাধারণ মানুষ ও গরীবদের প্রতি তাঁর কোন দরদ নেই। কিন্তু প্রকৃত সত্য সুলতান আইয়ুবী তার বক্তব্যে নিজেই পরিষ্কার করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'তাকে আরও বলে দাও, আমি তাকে রাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুক্ত করছি না।'

সুলতান আইয়ুবী কেবল সম্রাট গে অব লুজিয়ানকে মুক্তি দিলে তার মহত্ব ও মানবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতো। কিন্তু ঐতিহাসিকরা তার দয়া ও মমত্ববোধের আরো অনেক কাহিনী তাদের লেখায় তুলে ধরেছেন। এসব কাহিনীই প্রমাণ করে তিনি ছিলেন এক উদার ও মানবপ্রেমিক সমরনায়ক।

ঐতিহাসিকরা এক দরিদ্র খৃষ্টান মহিলার বর্ণনা লিখে গেছেন তাদের গ্রন্থে। এ ঘটনা সেই সময়ের, যখন গে অব লুজিয়ানের মুক্তির পর সাগর তীরের শহর আক্রাতে সুলতান অবস্থান করছিলেন এবং পরাজিত খৃষ্টান বাহিনী আবার সংগঠিত হয়ে আক্রা অবরোধ করে রেখেছিল।

খৃস্টান সৈন্যরা একত্রিত হয়ে ইউরোপীয় খৃস্টানদের সহযোগিতায় আক্রা অবরোধ করে। সুলতানের সৈন্যরা তখন দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অধিকাংশই ছুটিতে বাড়ী গিয়েছিল। সুলতান তার সীমিত শক্তি নিয়ে অবরোধ আটকে দেন। আক্রায় ঢুকতে না পেরে খৃস্টানরা শহর ঘেরাও করে অবস্থান নেয়। দীর্ঘ দুই বছর তাদের এ অবরোধ অব্যাহত ছিল।

সুলতান আইয়ুবীর কমান্ডো বাহিনী অবরোধকারী খৃষ্টানদের ক্যাম্পে আক্রমণ চালাতো। এ আক্রমণের তীব্রতা সইতে না পেরে পিছিয়ে যেতো খৃস্টান বাহিনী। কিন্তু কমান্ডোরা চলে গেলে আবার তারা আগের জায়গায় এসে অবস্থান নিত।

এভাবেই আগুপিছু করে সময় কাটাচ্ছিল ওরা। ওদের ধারনা ছিল, খাদ্য ও রসদের ঘাটতি পড়লে এক সময় মুসলমানরা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু কমান্ডোদের তৎপরতার

ফলে খাদ্য ও রসদ আসার পথ তারা কোনদিনই বন্ধ করতে পারেনি। এভাবে আক্রাতে দুই বাহিনীই সহাবস্থান করতে শুরু করে এবং এ অবস্থা চলে দীর্ঘদিন।

কমান্ডোরা খৃস্টান বাহিনীর বিভিন্ন অংশে আঘাত হেনে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখতো। এসব গেরিলা আক্রমণে প্রচুর ক্ষতিও হতো তাদের। নতুন খৃস্টান সেনা এসে সেই ক্ষতি তাদের পুষিয়ে নিতো।

আক্রায় যেসব বেসামরিক মুসলমান ছিল তারাও খৃস্টানদের উত্যক্ত করতো। কমান্ডোদের সহযোগিতা করতো। একইভাবে খৃস্টান বাসিন্দারা সহযোগিতা করতো খৃস্টান বাহিনীকে। মাঝে মধ্যে খৃস্টান-মুসলমান দাঙ্গাও হয়ে যেতো। মোটের ওপর আক্রার জনজীবনে এক অসহনীয় অবস্থা বিরাজ করছিল।

দেখা যেতো, কোন এক রাতে খৃস্টান বসতির উপর মুসলমান এলাকার বেসামরিক লোকেরা সহসা আক্রমণ করে বসেছে। তারা তাদের মালামাল লুট করে, কখনও কখনও লোকজনকেও ধরে নিয়ে আসতো ও তাদের বন্দী করে রাখতো।

খৃস্টান বাসিন্দারা তখন খৃস্টান সৈন্যদের কাছে গিয়ে অভিযোগ করতো, 'মুসলমানরা সব চোর ডাকাত! রাতে তারা মহল্লায় এসে আমাদের জিনিসপত্র চুরি করে বা কেড়ে নিয়ে যায়।'

খৃস্টান সৈন্যরা তাদের ওখানে পাহারার ব্যবস্থা করে। এরপর ঘটে উল্টো ঘটনা। খৃস্টান যুবকদের কোন দল মুসলিম মহল্লায় একইভাবে হামলা করে বসে। এভাবে বেসামরিক এলাকায়

চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা চলতেই থাকে।

এক রাতে এক উত্তেজিত মুসলমান খৃস্টান এলাকা থেকে তিন মাসের এক শিশুকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। এ শিশুটিই মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল। এই দুধের বাচ্চাকে তুলে আনলে মহিলা চিৎকার ও ক্রন্দন শুরু করলো।

মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে খৃস্টান সেনা কমান্ডারের কাছে গেল। তার অবস্থা তখন পাগলিনীর মতো। কিন্তু এ ব্যাপারে কমান্ডারের কিছু করার ছিল না।

মহিলা এবার খৃস্টানদের উচ্চপদস্থ এক সেনা অফিসারের কাছে গেলো। অফিসার তার কথা শুনে মহিলাকে বললেন, 'তুমি সুলতান আইয়ুবীর কাছে যাও। তিনি খুবই রহমদীল মানুষ। নিশ্চয়ই তোমার কান্না দেখে তার দয়া হবে।'

মহিলাটি ছুটে গেলো মুসলিম ক্যাম্পে। ক্যাম্পটি ওখান থেকে বেশী দূরে ছিল না। সুলতানের রক্ষীরা তার পথ আটকে দাঁড়ালে সে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমাকে শুধু একবার সুলতানের সাথে কথা বলতে দাও।'

রক্ষীদের দয়া হলো। তারা মহিলাকে সুলতান আইয়ুবীর কাছে পৌঁছে দিল। সুলতান আইয়ুবী তখন কোথাও যাওয়ার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বসেছেন। এক রক্ষী বললো, 'এক দরিদ্র খৃস্টান মহিলা ক্রন্দনরত অবস্থায় আপনার কাছে এসেছে। সে আপনার সাথে দেখা করতে চায়।'

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তাকে জলদি নিয়ে এসো। নিশ্চয়ই তার উপরে আমাদের কেউ অন্যায় আচরণ করেছে।'

মহিলাটিকে যখন সুলতান আইয়ুবীর সামনে হাজির করা হলো তখনো সে বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করছিল। সে সুলতানের অশ্বের সামনে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো আর মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগলো। সুলতান বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, 'উঠো। আমাকে বলো তোমার কি হয়েছে? কে তোমার ওপর জুলুম করেছে?'

মহিলা উঠে বসলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমাকে আমাদের সেনা কমান্ডার বললেন, 'তুমি সুলতান আইয়ুবীর কাছে যাও। তিনি খুব দয়াবান লোক। তিনি তোমার করুণ আবেদনের বিহীত করতে পারবেন।'

'তা তোমার আবেদনটি কি?'

'সুলতান!' মহিলা বললো, 'আমি আমার সন্তান ফেরত চাই। আপনার লোকেরা আমার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে।'

মহিলার কাছ থেকে ঘটনার বর্ণনা শুনে সুলতান আইয়ুবীর চোখও অশ্রুসজল হয়ে গেল। তিনি হিসাব করে দেখলেন শিশুটি চুরি হয়েছে আজ ছয় দিন। সুলতান আইয়ুবী অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে এলেন। তাঁর লোকদের বললেন, 'জলদি খোঁজ করো কে শিশুটিকে উঠিয়ে এনেছে।'

তিনি মহিলাকে শান্তনা দিয়ে বললেন, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি আপনার সন্তান আপমার কোলে তুলে না দিয়ে অন্য কোথাও যাবো না।'তিনি তার লোকদেরকে মহিলাটির জন্য আহারাদির ব্যবস্থা করতে বললেন।

সুলতান আইয়ুবী ঘোড়া থেকে নেমে আবার তার ক্যাম্পে ফিরে গেলেন। যেখানে যেতে চেয়েছিলেন সেখানে আর গেলেন না তিনি। সৈন্যরা মুসলিম মহল্লায় খোঁজ নিয়ে বের করে ফেললো, কে শিশুটি অপহরণ করেছিল। তারা তাকে ধরে সুলতানের কাছে সোপর্দ করে দিল।

লোকটি সুলতান আইয়ুবীর কাছে স্বীকার করলো, সে শিশুটি অপহরণ করেছে সত্য কিন্তু এখন শিশুটি তার কাছে নেই।

'কি করেছো তুমি শিশুটি?' সুলতানের চোখ রাগে ও ক্ষোভে লাল হয়ে গেল।

'আমি শিশুটি বিক্রি করে দিয়েছি।' অপরাধ স্বীকার করে বললো লোকটি।

সুলতান আইয়ুবী তার সৈন্যদের আদেশ দিলেন, 'এ লোক যার কাছে শিশুটি বিক্রি করেছে একে তার কাছে নিয়ে যাও।' তারপর লোকটিকে বললেন, 'তুমি যে মূল্যে শিশুটি তার কাছে বিক্রি করেছো সেই মূল্যে শিশুটিকে ফেরত দিতে বলবে। যদি এতে সে রাজি না হয় তবে সে যে মূল্য দাবী করে সেই মূল্য দিয়েই শিশুটিকে তুমি ছাড়িয়ে আনবে।'

তিনি আবার সৈন্যদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা সঙ্গে করে কিছু টাকা নিয়ে যাও যাতে শিশুটি ছাড়িয়ে আনতে কোন অসুবিধা না হয়?'

সুলতান শিশুটিকে না আনা পর্যন্ত তাঁর তাবুতেই অপেক্ষা করলেন। শিশুটি বেশী দূরে ছিল না। শিঘ্রই তাকে পাওয়া গেল এবং সৈন্যরা তার দাম মিটিয়ে দিয়ে নিয়ে এলো শিশুটি।

সুলতান আইয়ুবী নিজ হাতে শিশুকে তার মায়ের হাতে তুলে দিলেন। মা শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে এমন পাগলিনীর মত আদর করতে লাগলো যে তা দেখে সবারই হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। সুলতান আইয়ুবী মহিলাকে একটা ঘোড়া উপহার দিয়ে বিদায় জানালেন।

বায়তুল মোকাদ্দাসে মুসলমানদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফিলিস্তিনের মাটিতে খৃষ্টানদের বিপর্যয় ঘটে গেছে। তারা সবখানেই পরাজিত হয়েছে। পরাজিত সৈন্যরা অন্যান্য খৃস্টান রাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এই বিপর্যয় সমগ্র খৃস্টান জগতে এক ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো। মনে হলো প্রবল ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে গেছে খৃস্টানদের সাম্রাজ্য। সর্বত্র যেন ধ্বস নেমেছে।

এই সময় খৃষ্টান বিশ্বে তিনটি দেশ ছিল সবচে শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর। এ দেশগুলো শুধু অর্থ সম্পদেই বড় ছিল না তারা সামরিক শক্তিতেও শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতো। এদের মধ্যে প্রথমেই ছিল ইংল্যান্ড, দ্বিতীয় ফ্রান্স ও তৃতীয় জার্মানী।

তৎকালীন খৃস্টান পোপ দ্বিতীয় আরবানুস খৃস্টান শক্তির এই বিপর্যয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভেবে দেখলেন, আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যদি এখন শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা না যায় তবে সুলতান আইয়ুবী ফিলিস্তিন জয় করে বসে থাকবে না, সে এমনকি ইউরোপের মাটিতেও পা বাড়াতে পারে। ফলে একটি কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি এই তিন

খৃষ্টশক্তিকে একত্রিত করার উদ্যোগ নিলেন।
প্রথমেই তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি দেশ সফর করলেন এবং সেখানকার সম্রাটের সাথে দেখা করে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে তাদের প্রত্যেকের আশু করণীয় কি তা তুলে ধরলেন। তাদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সর্বত্র তিনি একই ধরনের বক্তব্য দিতে লাগলেন। সম্রাটদের সাথে সাক্ষাতে তিনি বললেন, 'যদি তোমরা যুদ্ধে না নামো তবে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সমস্ত ইউরোপ থেকে ক্রুশের শাসন উচ্ছেদ করে দেবে। তোমাদের দু'চোখ যেদিকে যায় সবখানেই তোমরা ইসলামী পতাকা পতপত করে উড়তে দেখতে পাবে।'
তিনি তাদের বললেন, 'এ যুদ্ধ সুলতান আইয়ুবীর নিজস্ব সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধ নয়, এটা খৃষ্টান ও ইসলামের ধর্ম যুদ্ধ। অর্থাৎ ক্রুশ টিকে থাকলে তুমি থাকবে আর হেলাল টিকে থাকলে থাকবে আইয়ুবী। তাই এটা ক্রুশ ও হেলালের যুদ্ধ। বাইবেল ও কোরআনের যুদ্ধ। গীর্জা ও মসজিদের যুদ্ধ। সেই সাথে এটা তোমার আমার অস্তিত্বেরও যুদ্ধ।
তুমি জানো, আমাদের পবিত্র ক্রুশ এখন মুসলমানদের হাতে। জেরুজালেমে মুসলমানদের পতাকা উড়ছে। হাজার হাজার খৃস্টান মেয়ে মুসলমানদের হাতে বন্দী রয়েছে। তাদেরকে মুসলমান সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হচ্ছে। এরপরও কি তোমরা ঘরে বসে থাকবে?
মুসলমানদের এই তুফানের গতি কি তোমরা এভাবেই

প্রতিরোধ করতে চাও? তোমরা কেমন করে এটা সহ্য করছো, যে ক্রুশে প্রভু যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন সেটি এখন মুসলমানদের হাতে থাকবে?'

পোপ দ্বিতীয় আরবানুস এমন সব কথা শুনিয়ে খৃস্টান সম্রাটদের উত্তেজিত করে তুললেন। যুদ্ধের উন্মাদনা নতুন করে ছড়িয়ে পড়লো খৃস্টান শিবিরে।

উত্তেজিত সম্রাটরা নতুন করে সৈন্য সমাবেশ ঘটালো ঈশ্বরের প্রতীক ক্রুশের মর্যাদা রক্ষার জন্য। তারা সুলতান আইয়ুবীর কাছ থেকে তাদের পবিত্র ক্রুশটি উদ্ধার করতে চায়। এ জন্য রক্তের নদী বইয়ে দিতেও আপত্তি নেই তাদের। পোপ দ্বিতীয় আরবানুসের আহবানে শুরু হলো নব উদ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রবল এক যুদ্ধের প্রস্তুতি। সুলতান আইয়ুবী তখন আক্রায় আস্তানা গেঁড়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

পরবর্তী বই ক্রুসেড-৩০

মহাসমর

ক্রুসেড-২৯
রিচার্ডের নৌবহর
আসাদ বিন হাফিজ